বুলেটিন নং: ৩৩
বর্ষ: ১১, সংখ্যা: ২
প্রকাশ কাল: ৩০ জুন ২০০৫
শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা $ 5

ইউপিডিএফ-এর ওয়েবসাইট
www.updfcht.org
Email: updfcht@yahoo.com

স্বাধিকার

THE SWADHIKAR

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

সাজেক এলাকায় সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

বাংলাদেশ সরকার রাঙ্গামাটির সাজেক এলাকায় নতুন করে সেটলার পুনর্বাসনের জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

দীঘিনালা থেকে আমাদের সংবাদদাতা সাইরেন চাকমা জানিয়েছেন, গত ২৩ জুন রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার সাজেক ইউনিয়নের ডেবাছড়া, নিউ লংকর, ওল্ড লংকর, হালিমবাড়ী ও চিঝক এলাকায় সেনা-বিডিআর কর্তৃক পাহাড়িদের ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে নিজ বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। শত শত পাহাড়ি পরিবার ইতিমধ্যে গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। আশে পাশের এলাকায় উচ্ছেদ আতঙ্ক বিরাজ করছে।

নিউ লংকর, ওল্ড লংকর, হালিমবাড়ী, দঝর, রুলোই এ অবস্থানরত বিডিআর সদস্যরা এ ভাঙচুর ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু এলাকায় পাহাড়িদের ঘরবাড়িও পরবর্তী ২/৩ দিনের মধ্যে ভেঙে দেয়া হবে বলে বিডিআর ঐসব গ্রামে খবর পাঠিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা কেন তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়া হচ্ছে তা জানতে চাইলে বিডিআর জওয়ানরা "উপরের নির্দেশ" বলে জানিয়ে দিয়েছে। কোন কোন এলাকায় উচ্ছেদের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে পাহাড়িরা ফরেষ্ট এরিয়ায় বসবাস করছেন। সেজন্য তাদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। অথচ, মাচালং বাজার, বাগেরহাট বাজার, মাচালং ক্যাম্প, বাগেরহাট ক্যাম্প, বাগেরহাট সেটলার পাড়া - এ এলাকাগুলো সবই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের মালিকানাধীন অর্থাৎ ফরেষ্ট এলাকা। এসব এলাকায় অভিযান চালিয়ে কাউকে উচ্ছেদ করার ঘটনা ঘটেনি। বাগেরহাট সেটলার পাড়ায় নির্বিঘ্নে দিন যাপন চলছে। তাদের নিরাপত্তা বিধানে বিডিআর অতন্দ্র প্রহরী। অন্যদিকে মাচালং এর কাছে নন্দরাম এলাকায় বসবাসরত পাহাড়িদের উচ্ছেদ করে তাদের বাড়িঘর ভেঙে দেয়া হবে বলে সেনা বিডিআররা হুমকি দিচ্ছে। সেনা-বিডিআর কর্তৃক উচ্ছেদ অভিযানের কারণে বর্তমানে সাজেক এলাকায় চরম উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সেটলারদের পুনর্বাসন করার জন্যই পাহাড়িদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। সম্প্রতি নন্দরাম এলাকায় একটি বহিরাগত বাঙালী সেটলার পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

সরকার সাজেক এলাকায় বাঙালী পুনর্বাসন করতে যাচ্ছে বলে দীর্ঘদিন ধরে জোর গুঞ্জন চলে আসছে। সম্প্রতি ওয়াদুদ ভূঁইয়া এমপি এক সাক্ষাতকারে সরকারের এই ধরনের পরিকল্পনার কথা স্বীকার করেছেন। দীঘিনালার বাবুছড়ায় বিডিআর ক্যাম্প স্থাপনের জন্য সরকার কয়েক মাস আগে জায়গা মালিকদের কাছে হুকুম দখল নোটিশ পাঠিয়েছে। এ নিয়ে এলাকায় চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে।। তার সাথে সাজেক এলাকায় পাহাড়ি উচ্ছেদের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর লোকজনের মুখ থেকে ক্ষুব্ধ মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। তারা বলছেন ব্যাপক প্রতিবাদ বিক্ষোভ ছাড়া উপায় নেই। সাজেক এলাকায় যে কোন মূল্যে সেটলার পুনর্বাসন রুখতে হবে। তারা ইউপিডিএফ-কে ৭ জুন মহাসমাবেশর মতো বা তার চাইতে আরো কঠোর কর্মসূচী দেয়ার দাবি জানাচ্ছেন। তা না হলে তারা নিজেরাই কর্মসূচী দেবে বলে দীঘিনালার জনগণের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

অন্য দিকে জেএসএস এর ওপর জনগণ চরম ক্ষুব্ধ। তারা বলছেন, জেএসএস জাতীয় স্বার্থে ইউপিডিএফ এর সাথে সমঝোতায় না এসে সরকারকে এভাবে লাভবান করছে। সরকারের এ ধরনের গণবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জেএসএস নিজেও কর্মসূচী দেয় না, আন্দোলন করে না। আবার ইউপিডিএফ আন্দোলন করতে চাইলে তাতে মরিয়া হয়ে বাধা দেয়। *সন্ত লারমা জাতুয়্যরে হেবার লাক লুয়ে নাহি,* (সন্ত লারমা জাতিকে ধ্বংস করার পথ ধরেছে নাকি) নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীর প্রশ্ন।

সাজেক এলাকায় সেটলার পুনর্বাসনের চক্রান্ত যে কোন মূল্যে রুখতে হবে। ইতিমধ্যে পাহাড়িদের বহু এলাকা সরকার জোরপূর্বক দখল করে নিয়ে সেখানে সেটলারদের বসিয়ে দিয়েছে। পুরো ফেনী অঞ্চল, বান্দরবানের বেশ কয়েকটি থানাসহ আরো অনেক এলাকা এখন সেটলারদের দখলে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। প্রতিরোধ করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। সাজেক এলাকা রক্ষার জন্য দ্রুত প্রস্তুতি নিন। এলাকায় এলাকায় সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করুন। এসব প্রতিবাদ প্রতিরোধে সামিল হওয়ার জন্য জনসংহতি সমিতির সদস্যদের প্রতিও আহ্বান জানান। ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করে পৈতৃক বাস্তুভিটা রক্ষার্থে সমঝোতায় আসার জন্য জেএসএস এর ওপর চাপ অব্যাহত রাখুন।

ইউপিডিএফ সাজেক এলাকায় সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করবে। ইউপিডিএফ এর পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে সামিল হোন। আসুন নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম জোরদার করি। বিজয় আমাদের অনিবার্য। ■

ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে খাগড়াছড়িতে বিশাল সমাবেশ

ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে খাগড়াছড়ির স্বনির্ভর মাঠে আয়োজিত মহাসমাবেশের একাংশ। ফটো: অনুতোষ চাকমা

সভা পণ্ড করতে সেনা হয়রানি
জেএসএস-এর বাধা দান

বিশেষ রিপোর্ট

পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত ভূমি বেদখল, সেনা-বিডিআর ক্যাম্প সম্প্রসারণ ও নতুন করে সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ৭ জুন খাগড়াছড়িতে হাজার হাজার নারী পুরুষ সমাবেশে অংশ নেন। ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর উদ্যোগে এই মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সকাল ১১টায় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও কয়েকটি পয়েন্টে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সেনা সদস্যরা সমাবেশে যোগ দিতে আসা লোকজনদের আটকিয়ে রাখায় অনুষ্ঠান শুরু করতে দেরী হয়ে যায়।

বেশ কয়েকটি এলাকা থেকে গাড়িতে করে ইউপিডিএফ এর সমর্থকরা এসে পৌঁছার আগেই দুপুর ১টায় মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি স্বনির্ভর থেকে শুরু হয়ে খাগড়াছড়ি বাজারের ব্রিজ পর্যন্ত গিয়ে আবার স্বনির্ভরে ফিরে আসে। এর পর সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ইউপিডিএফ চট্টগ্রাম অঞ্চলের সংগঠক অনিমেষ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি ইউনিটের নেতা উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা, দেবদত্ত ত্রিপুরা, ইউপিডিএফ বান্দরবানের প্রতিনিধি ছোটন তঞ্চঙ্গ্যা, যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অন্তরিকা চাকমা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, স্বাধীনতার পর দেশের প্রত্যেকটি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণকে নিজ জন্মভূমি থেকে উৎখাত করার জন্য তাদের জায়গা জমি জবর দখল করে চলেছে, একের পর এক সেনা-বিডিআর ও অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প সম্প্রসারণ করছে এবং কখনো প্রকাশ্যে ও কখনো গোপনে বেদখলকৃত জায়গায় সেটলার পুনর্বাসন করছে। পাহাড়ি জনগণের পিঠ আজ দেয়ালে ঠেকেছে। আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। ভারতে পালিয়ে গিয়েও কোন কিছু হয়নি।

৭ম *পাতায় দেখুন*

জনগণের প্রতি ইউপিডিএফ -এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

রাস্তায় রাস্তায় বাঁধা সৃষ্টি, সেনা চেকপোষ্ট, তল্লাশী, সন্ত চক্রের হুঁশিয়ারী, জরিমানা, হরতাল, বাস আটক সত্ত্বেও যারা সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে ৭ জুন মহাসমাবেশে অংশ নিয়েছেন, তাদের অভিনন্দন!

পানছড়ি, দীঘিনালা, কুদুকছড়ি, মহালছড়ি থেকে সরকার-মদদপুষ্ট সন্ত সন্ত্রাসীদের ষড়যন্ত্রের কারণে অংশ নিতে পারেননি, আমরা তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছি। জনতার বাঁধভাঙা জোয়ার ও স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কারণে মহাসমাবেশ সফল হয়েছে।

এছাড়া, ইউপিডিএফ কিংবা তার সহযোগী সংগঠনের কোন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের কারণে যারা বিভিন্নভাবে লাঞ্ছনা, শারীরিক নির্যাতন কিংবা নিগ্রহের শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আমরা মনে করি, যারা ইউপিডিএফ কিংবা তার সহযোগী সংগঠনের সভা সমাবেশ বা মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন বা অংশগ্রহণ করতে চেয়েছেন, তারা সুমহান দায়িত্ববোধ ও অধিকার সচেতনতা থেকেই তা করেছেন।

নিজের অধিকার নিজেকেই আদায় করতে হয়। অধিকার আদায় করতে হলে দরকার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। আশাকরি ভবিষ্যতেও আমরা আপনাদেরকে আমাদের সাথে পাবো।

খাগড়াছড়িতে পিসিপি'র প্রচার টিমের ওপর জেএসএস সদস্যদের হামলা

গত ১৮ মে খাগড়াছড়িতে জেএসএস সদস্যরা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রচার টিমের সদস্যদের বহনকারী একটি গাড়ির ওপর হামলা চালিয়েছে। এতে দুই সংগঠনের ৭ জন কর্মি ও গাড়ির এ্যাসিস্টেন্ট আহত হয়েছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

২০ মে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান মাইক দিয়ে প্রচার করার জন্য পিসিপি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের একটি যৌথ টিম গাড়িসহ বের হয়। তারা খাগড়াছড়ি বাজারের কাছে নারিকেল বাগান নামক স্থানে আসলে আগে থেকে ওঁত পেতে থাকা জেএসএস এর সদস্যরা গাড়ি লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে গাড়ির কাঁচ ভেঙে যায় ও ড্রাইভারের সহকারী সুখী রঞ্জন ত্রিপুরাসহ মোট ৮ জন আহত হয়। এরা হলো পিসিপি সদস্য সুহেল চাকমা, রাসেল চাকমা, সন্তোষ চাকমা, অপু চাকমা, ভবতোষ চাকমা (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ঝনাত চাকমা ও জুঁই চাকমা।

ইউপিডিএফ এর আহ্বায়ক প্রসিত খীসা ঘটনার নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতি দেন। তিনি অবিলম্বে হামলার সাথে জড়িত জেএসএস সদস্যদের গ্রেফতার ও শাস্তি দেয়ার দাবি জানান। তিনি বলেন, এই হামলা আবারো প্রমাণ করেছে যে, সন্তু চক্র পার্বত্য চট্টগ্রামে পুরোপুরি "রাজাকারের" ভূমিকা পালন করছে।

খাগড়াছড়িতে সন্তু বাহিনী ভূমি বেদখল বিরোধী পোষ্টার ছিঁড়ে দিয়েছে

সরকার-মদদপুষ্ট সন্তু বাহিনী (আগে ছিল শান্তি বাহিনী) ২২মে খাগড়াছড়ির চেঙ্গী স্কোয়ারের দেয়ালে সাঁটা ইউপিডিএফ-এর ৭ জুন ভূমি বেদখল বিরোধী সমাবেশের পোষ্টার ছিঁড়ে দিয়েছে। এ সময় সন্তু বাহিনীর সদস্যরা মুখোশ পরিহিত ছিল। টহলরত পুলিশ এ সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার ও সেনাবাহিনী কর্তৃক অব্যাহত ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে ইউপিডিএফ ৭ জুন খাগড়াছড়িতে এক মহাসমাবেশের ডাক দেয়। জনগণকে এই সমাবেশে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে ইউপিডিএফ একটি পোষ্টারও ছাপায় যা খাগড়াছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় লাগানো হয়। কিন্তু সরকার মদদপুষ্ট সন্তু বাহিনীর সদস্যরা খাগড়াছড়ির চেঙ্গী স্কোয়ারের দেয়ালে লাগানো পোষ্টারগুলো ছিড়ে দিতে থাকে। এ ঘটনা জানতে পেরে উত্তেজিত জনতা তাদেরকে ধাওয়া করে তাড়িয়ে দেয়।

দীঘিনালায় জেএসএস সদস্য কর্তৃক ১৫ পিসিপি কর্মি অপহৃত

দীঘিনালা প্রতিনিধি

সরকার-মদদপুষ্ট সন্তু বাহিনীর সদস্যরা দীঘিনালায় ২০মে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৫ কর্মিকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করেছে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সদস্যরা খাগড়াছড়িতে তাদের সংগঠনের ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে একটি জীপ গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলেন। গাড়িটি বড়াদমে সন্তু বাহিনীর সদস্যদের আস্তানা খ্যাত রিবেং ক্লাবে পৌঁছলে আটকানো হয়।

পরে সন্তু সন্ত্রাসীরা বেছে বেছে ১৫ জন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মি ও সমর্থককে অস্ত্রের মুখে নিয়ে যায়। অপহৃতদের কয়েক জন হলেন মিতো চাকমা, সুমন চাকমা, নিপন চাকমা, সুশীল চাকমা, উদ্দীপন চাকমা ও সোনাধন চাকমা।

অপহরণকারী সন্তু বাহিনীর মূল হোতারা হলো ধর্মবীর চাকমা, প্রীতি চাকমা ও সাধন চাকমাসহ আরো কয়েকজন। অপহরণের সময় ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পুলিশ থাকলেও তারা ছিল নীরব।

অপহরণের দু'দিন পর মুক্তিপণের বিনিময়ে শর্ত সাপেক্ষে জেএসএস তাদেরকে ছেড়ে দেয়। অপহৃতদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। মেয়েরাও এ থেকে বাদ যায় নি। জেএসএস সদস্যরা সীমা চাকমাকেও, ১৮, (পিতা রবিচন্দ্র চাকমা, গ্রাম বাঘাইছড়ি মুখ) মারধর ও লাঞ্ছিত করে। আত্মসমর্পনের পর থেকে সন্তু চক্র সরকারের কেনা গোলামে পরিণত হয়েছে। সরকারকে লাভবান করার জন্য সন্তু চক্র ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রেখেছে। সরকারের আশ্রয় প্রশ্রয়ে থেকে তার লেলিয়ে দেয়া বাহিনী খুন, অপহরণ, জোরপূর্বক চাঁদা আদায় ইত্যাদি করে বেড়াচ্ছে। তরুণ যুব সমাজকে নেশায় আসক্ত করছে।

অপরদিকে সন্তু লারমা আওয়ামী লীগ আমলে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য হরহামেশা গলা ফাটিয়ে চিৎকার, হুম্বি তম্বি , রক্ত দেয়ার শপথ নিলেও কোন ধরনের আন্দোলনে যায়নি। বর্তমানে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর আন্দোলনের হুমকি আর তার কণ্ঠ থেকে শোনা যায় না। কেবল নীচু স্বরে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। আঞ্চলিক পরিষদের গদি টিকিয়ে রাখার জন্যই সন্তু বাবুকে এসব করতে হচ্ছে।

পিসিপি কর্মসূচীতে অংশ নেয়ায় মহালছড়িতে প্রহৃত ১৫

পিসিপি'র ২০ মে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচীতে অংশ নেয়ার কারণে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যরা মহালছড়িতে ১৫ ব্যক্তিকে মারধর করেছে।

গত ২৮ মে তারা ৭টি গ্রামের ১৫ জনকে তাদের আস্তানা-খ্যাত মুভাছড়িতে ডেকে নিয়ে তাদের ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালায় এবং পরবর্তীতে ইউপিডিএফ কিংবা তার সহযোগী সংগঠনের কর্মসূচীতে অংশ না নেয়ার জন্য হুমকি দেয়।

নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা হলেন, বাজেছড়া গ্রামের সরল কার্বারী (৪৮), শুদ্ধধন চাকমা (৫৫), বাত্যা চাকমা (৩৪), সুয্য সেন চাকমা (৩৪) ও কালা চোখ্যা চাকমা (৩৩); তারাছড়ি গ্রামের বিকোন বিজি কার্বারী (৫৫), সত্যবান চাকমা (৪০), দেব চাকমা (২৬), মঙ্গল চাকমা (৪৫) ও শংকর চাকমা (৪২) এবং বিমল কান্তি চাকমা, ৩৫ গ্রাম উত্তর কেদল ছড়ি, সাধন কুমার চাকমা (কার্বারী), ৩৮ গ্রাম থামার পাড়া, মুরতি চাকমা (কার্বারী), ৫৫ গ্রাম গাদছড়া, জয় কৃষ্ণ চাকমা, ৪২ ইউপি মেম্বার গ্রাম ফরেস্ট অফিস এবং শান্তি প্রিয় বাপ, ৫৫, হেডম্যান পাড়ার কার্বারী।

ইউপিডিএফ-এর মামলা হাতে না নিতে উকিলকে জেএসএস-এর হুমকি

গত ২৫মে সরকার-মদদপুষ্ট জনসংহতি সমিতির সদস্যরা এডভোকেট জ্ঞান জ্যোতি চাকমাকে হুমকি দিয়ে বলেছে তিনি যেন আটককৃত ইউপিডিএফ-এর নেতাকর্মিদের মামলা পরিচালনা না করেন। এছাড়া, খাগড়াছড়ি জেলে আটককৃত ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করার দায়ে তার কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা ও তার দুজন সহকারীর কাছ থেকে দুই লাখ টাকা জেএসএস সন্ত্রাসীরা দাবি করেছে। ৩১মের মধ্যে দিতে ব্যর্থ হলে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে হুমকি দেয়া হয়েছে।

জেএসএস সদস্যরা মহাজনপাড়ায় জ্ঞান জ্যোতি চাকমার বাসায় গিয়ে এই হুমকি দেয়।

খাগড়াছড়িতে জেএসএস কর্তৃক ড্রাইভার অপহৃত, মুক্তিপণ আদায়

সরকার-মদদপুষ্ট জেএসএস সদস্যরা ২৪ মে পিক আপ ভ্যান চালক পূণ্য মনি চাকমাকে (বয়স২৫, পিতা বীরপাক্ষ চাকমা) অপহরণ করে। তিনি খাগড়াছড়ির পেরাছড়ার ধর্মপুর গ্রামের বাসিন্দা। অপহরণের কারণ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের প্রচারণায় তার গাড়িকে ভাড়া দেয়া।

জেএসএস সদস্যরা তাকে বেদম মারধর করে ও তার মুক্তির জন্য ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। পরে গাড়ির মালিক জনৈক প্রাক্তন জেএসএস সদস্য ২০ হাজার টাকা দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।

বোয়াল খালী বাজার বয়কটের নামে জেএসএস কি করছে?

তুজিম, *বড়াদম দীঘিনালা থেকে*

খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা থানাধীন বোয়ালখালী বাজারে (বর্তমানে নতুন বাজার) যে সকল ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের জায়গা জমি রয়েছে তারা আজও ফিরে পাননি। বাজারটি তুলে না নেয়া পর্যন্ত এসব জায়গা জমি ফেরত পাওয়ার কথাও নয়। তাই জেএসএস ঐ বাজার বয়কটের ডাক দিয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নিজেরা বয়কটের ডাক দিলেও জেএসএস এর লোকজন উক্ত বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে থাকে। বাজারে তাদের রীতিমত আনাগোনাও চলছে। অথচ তাদের দেখাদেখি সাধারণ মানুষ জন ঐ বাজার থেকে কোন কিছু কিনলেই তার বিরুদ্ধে "শাস্তিমূলক ব্যবস্থা" গ্রহণ করা হচ্ছে। এটা কি ধরনের বিচার ও কি ধরনের বয়কট তা জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সাধারণ এলাকাবাসীর মতে আইন হলে তা সবার জন্য প্রযোজ্য হবে। কিন্তু জেএসএস সাধারণ মানুষের জন্য করে এক আইন ও নিজেদের জন্য আর এক আইন। এ জন্য এলাকাবাসী এখন জেএসএস এর উপর খুবই ক্ষুব্ধ।

কোন ব্যক্তি (জেএসএস ভিন্ন) বোয়াল খালী নতুন বাজার থেকে কোন জিনিস কেনার পর ধরা পড়লে কিংবা প্রমাণ পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে জেএসএস-এর পক্ষ থেকে। ঐ বাজার থেকে কেনার অভিযোগে জেএসএস-মদদপুষ্ট দুই নাম্বারী পিসিপি নেতা প্রীতি খীসা ৫ নং বাবুছড়া ইউপি মহিলা সদস্য মিসেস গোপা দেবী চাকমার ১০ ব্যাগ সিমেন্ট জব্দ করে। এর মধ্য থেকে ৬ ব্যাগ সিমেন্ট দিয়ে সে নিজস্ব বাড়ির কাজে ব্যবহার করে। বাকি ৪ ব্যাগ ও নগদ ১০০০ টাকা গ্রামবাসীর চাপাপিতে ফেরত দিতে সে বাধ্য হয়।

গত ২৭ এপ্রিল বাবুছড়া নোয়া বাজার এলাকার বাসিন্দা অরচন্দ্র চাকমার (পিতা ল্যাংগ্যা) কাছ থেকে ৩০ বস্তা চাল জব্দ করা হয়। এই জব্দ করা চালের ব্যাপারে জেএসএস দীঘিনালা থানা শাখার নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা এ বিষয়ে অবগত নয় বলে প্রথম দিকে জানায়। পরে চাপাচাপির পর তারা এই বলে আশ্বাস দেয় যে, খোঁজ খবর নিয়ে চালগুলো ফেরত প্রদান করা হবে। কিন্তু খবর পাওয়া গেছে যে, জব্দ করা মাত্রই চালগুলো জেএসএস-এর লোকজন নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। কোন চাল কিংবা তার বদলে টাকা মালিককে ফেরত দেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে এখন খোদ জেএসএস-এর মধ্যে বাক বিতণ্ডা দেখা দেয়। কারণ জেএসএস-এর নেতৃত্ব অরচন্দ্র চাকমাকে চাল ফেরত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, অথচ এদিকে সাধারণ কর্মিরা চালগুলো হজম করে ফেলেছ। ফলে জেএসএস এর নেতৃত্ব মনে করছে তারা কর্মিদের কারণে লোকজনের কাছে হেয় হয়ে গেছে।

জনগণের কথা হলো, বাজার বয়কট করলে সবাই করবে। জেএসএস-কেও করতে হবে। সবার জন্য এক নিয়ম হতে হবে। নিজেরা বয়কটের ডাক দেবে অথচ নিজেরাই তা লঙ্ঘন করলে কোন শাস্তি হবে না, অপরদিকে সাধারণ লোকজন কিছু কিনলেই মহা অপরাধ হয়ে যাবে ও তার জন্য শাস্তি দেয়া হবে, সেটা তো হতে পারে না। লোকজন এখন বলাবলি করছেন, জেএসএস এ রকম বলেই তাদেরকে আত্মসমর্পন করতে হয়েছে।

লন্ডনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বিষয়ক ইউরোপিয়ান মানবাধিকার সম্মেলনে প্রদত্ত জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক -যুক্তরাজ্য-এর বক্তব্য

[গত ১৭ জুন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এ বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত জুম্মদের সংগঠন জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়াক-যুক্তরাজ্য-ও এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। সংগঠনের পক্ষে বক্তব্য পেশ করেন ***শিবাশীষ রায়****। নিম্নে তার বক্তব্যের কিছু অংশ অনুবাদ করে ছাপা হলো:]*

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর দেশের প্রথম সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের স্বতন্ত্র পরিচিতির কোন উল্লেখ করা হয়নি। বরং পাকিস্তান সংবিধানে প্রদত্ত "ট্রাইবাল এরিয়া"-র মর্যাদা লুপ্ত করা হয়।

রাজনৈতিক চিত্র ও শান্তিচুক্তি: বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সংঘাত চলে নব্বই দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত। এরপর কয়েক দফা আলোচনার পর তাদের মধ্যে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও অন্যান্য ছাত্র কর্মিরা মনে করে যে, এই চুক্তিতে পাহাড়ি জনগণের মৌলিক দাবিগুলো পূরণ করা হয়নি। তারা ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) গঠন করে এবং পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আদিবাসী জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, চুক্তিটির কোন সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই এবং সংসদ এটা বাতিল করতে পারে।

সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালী পুনর্বাসনের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। বেআইনী অভিবাসনের ফলে সৃষ্ট জনভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে এবং এর ফলে অসংখ্য গণহত্যা, গণধর্ষণ, বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং পৈতৃক ভিটেবাড়ি থেকে আদিবাসী লোকজনদেরকে জোরপূর্বক উচ্ছেদের ঘটনা ঘটে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ২০০১ সালে সেটলারদেরকে অন্যত্র পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশ সরকার তা তাৎক্ষণিকভাবে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে সত্য, কিন্তু চুক্তির প্রধান ধারাগুলো এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামকে বেসামরিকীকরণ করা হয়নি এবং ভূমি কমিশন এখনো কার্যকরী হয়নি, যদিও চুক্তির প্রায় আট বছর পর এ মাসের প্রথম দিকে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

আনুমানিক এক লাখ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতায়েন রয়েছে। এই বিশাল সামরিক উপস্থিতির জন্য বছরে প্রায় ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করা হয়। এই টাকা কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও গঠনমূলক কর্মসূচীতে খরচ করা যেতো।

মানবাধিকার লঙ্ঘন: চুক্তি স্বাক্ষরের পরও আদিবাসী জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত সহিংসতার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। .... আদিবাসী নেতা, মানবাধিকার ও ছাত্র কর্মিদেরকে প্রতিনিয়ত হয়রানি, নির্যাতন ও মিথ্যা অভিযোগে অন্তরীণ রাখা হয়।

নিরাপত্তা বাহিনী ও সেটলার কর্তৃক পরিচালিত গণহত্যা: উপরোল্লিখিত ঘটনাগুলো ছাড়াও, ১৩টির অধিক বড় ধরনের গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৮০ সালের কাউখালি গণহত্যা, ১৯৮৯ সালে লংগদু গণহত্যা, ১৯৯২ সালে লোগাং গণহত্যা, ১৯৯৩ সালে নান্যাচর গণহত্যা উল্লেখযোগ্য। এইসব গণহত্যায় শত শত লোক প্রাণ হারায়, অত্যাচারিত হয়, ধর্ষিত হয় ও ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই গণহত্যাগুলোর কোনটিই যথাযথভাবে তদন্ত হয়নি বা তদন্ত হলেও রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। ... যে সব সামরিক অফিসার গণহত্যা ঘটিয়েছে তাদেরকে কেবল যে শাস্তি দেয়া হয়নি তা নয়, তাদেরকে উল্টো পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

কল্পনা চাকমার অপহরণ: ১৯৯৬ সালের ১১ জুন রাতে ২৩ বছর বয়সী মানবাধিকার কর্মি কল্পনা চাকমাকে (আসলে তিনি হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী-অনুবাদক) রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার লাল্যাঘোনা গ্রামের তার নিজ বাড়ি থেকে লেঃ ফেরদৌসের নেতৃত্বে এক দল সাদা পোষাকধারী সেনা সদস্য অপহরণ করেছিল। অনেক প্রতিবাদ ও তার ব্যাপারে তদন্ত করার দাবি সত্ত্বেও তাকে কোথায় রাখা হয়েছে তা এখনো অজানা রয়েছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে প্রত্যাগত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর সংশ্লিষ্টতা: আপনারা জানেন, বাংলাদেশ সারা বিশ্বে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অন্যতম বৃহৎ অংশগ্রহণকারী দেশ। এটা খুবই লজ্জাজনক যে, ফিরে আসা শান্তিরক্ষীরা নিজের দেশের সহ-নাগরিকদের উপর দমন পীড়ন চালাচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ, জানা গেছে যে ২০০৩ সালে মহালছড়ি ঘটনার সাথে যুক্ত লেঃ কঃ আব্দুল আওয়াল নামে একজন জোন কমান্ডার সিয়েরা লিয়োনে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব শেষ করে বাংলাদেশে ফিরেছিলেন।

ইসলামীকরণ: দেশের অমুসলিম নাগরিকদের সম্মতি ব্যতিরেকে ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে ১৯৮৮ সালে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করা হয়। যদিও সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও খোদ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক ধর্মীয় স্বাধীনতার হরণ ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়, বরং নিয়মিত ব্যাপার। জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণও চলছে। সামরিক সূত্র অনুসারে, "বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের কাছে একটি গোপন চিঠি প্রচার করেছে। এতে আত্মীকরণ ঘটানোর লক্ষ্যে পাহাড়ি নারীদের বিয়ে করতে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে।"

সৌদি সরকারের অর্থে পরিচালিত আল রাবিতা হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রধান ইসলামিক মিশনারী সংগঠন। সামরিক বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট এই সংগঠনটির কাজ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামীকরণ করা। জামাতে ইসলামী পার্বত্য অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর সাথে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে থাকে। মসজিদ ও মাদ্রাসার সংখ্যাও ব্যাপকভাবে বেড়েছে - যেখানে ১৯৬১ সালে ৪০টি মসজিদ ও ২টি মাদ্রাসা সেখানে বর্তমানে এই সংখ্যা ৬ শ'এরও বেশী।

নতুন বসতিস্থাপন: যদিও সরকার বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, পুনরায় বসতিস্থাপন বন্ধ করা হবে, কিন্তু বাস্তবে উল্টোটাই ঘটছে। সম্প্রতি জানা গেছে যে, বাংলাদেশ সরকার কাচালং রিজার্ভ ফরেষ্টের সাজেক এলাকায় ১০ হাজার পরিবারকে বসতি দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে আরো অনেক জুম্ম তাদের পৈতৃক জমি ও ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত হবে। অধিকন্তু, খাগড়াছড়ি জেলার বাঘাইছড়িতে একটি নতুন বিডিআর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হবে। এর ফলে হাজার হাজার জুম্ম পরিবার উচ্ছেদ হবেন। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-অর্থায়িত ব্যবসায়িক প্লান্টেশন প্রজেক্টগুলোর কারণেও জুম্মরা তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন। তাদেরকে কোন প্রকার পুনর্বাসন করা হয়নি, এবং পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি।

১৯৯০ দশকের মধ্যভাগে যে সব জুম্ম শরণার্থী ভারত থেকে ফিরে এসেছিলেন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তাদেরকে যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা হয়নি। তাছাড়া, আভ্যন্তরীণ শরণার্থী হিসেবে তালিকাভুক্ত ৮২ হাজার জুম্ম পরিবার এখনো সরকারী সাহায্যের অপেক্ষায় দিন গুনছে।

শেষে নিম্নলিখিত দাবিগুলো বাংলাদেশ সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য জেপিএন-কে এর পক্ষে আমি আপনাদের সবার কাছে আহ্বান জানাচ্ছি: ১. শান্তিচুক্তির পূর্ণবাস্তবায়ন করা ২. সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পুনর্বাসিত সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন দেয়া, ৩. জেল থেকে মানবাধিকার ও ছাত্র কর্মিদের মুক্তি দেয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের ওপর তথা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর পরিচালিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করা। ■

লক্ষ্মিছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই পিসিপি কর্মি ধৃত, পরে মুক্তি

গত ২৬ এপ্রিল খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মিছড়ি জোনের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কঃ মোমিন খান বর্মাছড়ি ইউনিয়নের বড়ইতলি গ্রাম থেকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দুই কর্মিকে গ্রেফতার করেন। এরা হলেন পিসিপি লক্ষ্মীছড়ি থানা শাখার নেতা সুশীল চাকমা ও কালাধন চাকমা। তারা এ সময় বর্মাছড়ি এলাকায় সাংগঠনিক সফর করছিলেন।

সেনারা তাদের ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালায় ও রাঙ্গামাটি জেলার ঘাগড়া ক্যাম্পে চালান দেয়। পরে গত ২৯ এপ্রিল তাদেরকে বান্যাছোলা আর্মি ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। ইদানিং পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা বাহিনীর উপদ্রব সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গেছে। গ্রেফতার, আটক, নির্যাতন এখন নিত্য দিনের ঘটনা। লক্ষ্মীছড়ি, কাউখালি ও কুদুকছড়ি এলাকায় এ হার অনেক বেশী। সম্প্রতি গত ২৩ এপ্রিল থেকে এই তিন এলাকায় সেনারা তথাকথিত অপারেশন চালায়। তারা রাত বিরাতে গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে নিরীহ লোকজনকে হয়রানি ও মারধর করে। মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। সাধারণত ইউপিডিএফ-এর সদস্য সন্দেহে লোকজনকে আটক করা হয়।

রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ১৮ আদিবাসী বাঙালী নেতা প্রহৃত

পার্বত্য চট্টগ্রাম আদি ও স্থায়ী কল্যাণ পরিষদের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন সেনা সদস্যরা তাদের ১৮ জন নেতাকে আলোচনার নামে রাঙ্গামাটি আর্মি রিজিয়ন্যাল সদর দপ্তরে ডেকে নিয়ে মারধর করা হয়েছে। সংগঠনটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে গত ২ জুন সংগঠনের সভাপতি ইউসুফ আলম, সহসভাপতি জাকের হোসেনকে সেনারা তাদের ৩ জুনের পূর্ব নির্ধারিত একটি সমাবেশ বাতিল করতে বলে, অন্যথায় ক্রসফায়ারে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দেয়।

সংগঠনের নেতা কর্মিরা এই ঘটনার প্রতিবাদে শহরের শিল্পকলা একাডেমির সামনে এক সমাবেশ করেন এবং পরে মিছিল বের করেন।

বাঙালী স্থায়ী বাসিন্দাদের সংগঠনটির অন্যতম নেতা আজম আলীকে আহত অবস্থায় রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

লক্ষ্মীছড়িতে পিসিপি সদস্য গ্রেফতার

গত ১৯ জুন ২০০৫ লক্ষ্মীছড়ি জোনের আর্মি সদস্যরা স্বপন কুমার বসু (২২) নামে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের এক সদস্যকে জোর করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রানি করা হয়।

পরে সেনারা তাকে ছেড়ে দেয়া বলে জানা গেছে। কি কারণে তাকে ধরে নেয়া হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে তার এক ভাই রতন বসু ইউপিডিএফ এর সক্রিয় সদস্য হওয়ার কারণে এভাবে তাকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগে মানিকছড়ির জামতলা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিল। তার বিরুদ্ধে ডাকাতি মামলা জুড়িয়ে দেয়া হয় সে সময়। পরে সে জামিনে ছাড়া পায়।

ইদানিং লক্ষ্মীছড়ির সেনা সদস্যরা খুবই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। গায়ের জোর খাটিয়ে তারা লোকজনকে হরহামেশা হয়রানি ও মারধর করে থাকে। জনগণের মানবাধিকার তারা থোরাই পরোয়া করে। সাধারণ সিভিল প্রশাসনেও তারা হস্তক্ষেপ করে থাকে। গত এপ্রিল মাসে টিএনও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী করার অনুমতি দিলেও সেনারা তাতে বাধ সাধে। ফলে একেবারে চূড়ান্ত মুহূর্তে ফোরাম তাদের কর্মসূচী বাতিল করতে বাধ্য হয়। বর্তমান জোন কমান্ডার একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি এলাকায় ইউপিডিএফ-কে হটিয়ে দিয়ে জেএসএস-কে এনে বসিয়ে দেবেন। তবে এলাকায় ইউপিডিএফ-এর প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন দেখে বিস্মিত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

তাছাড়া ইদানিং লক্ষ্মীছড়িতে "আঙুল বাহিনীর" দাপট বেড়ে গেছে। এরা দু পাইস কামানোর জন্য নিরীহ লোকজনের বিরুদ্ধে সেনা ক্যাম্পে বিভিন্ন বানোয়াট রিপোর্ট দিয়ে থাকে। সেনরাও তথাকথিত "জনগণের হৃদয় মন জয় করার" কর্মসূচীতে বরাদ্দকৃত অর্থের সামান্য অংশ এ ধরনের কাজে ব্যয় করে বাকি টাকা তারা নিজেরা আত্মসাৎ করে থাকে।

বুছড়ায় বিডিআর-এর ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার নির্মাণের নামে জমি বেদখল: বহু পরিবার উচ্ছেদের মুখে

দীঘিনালা প্রতিনিধি

বাংলাদেশ সরকার খাগড়াছড়ির বাবুছড়ায় বিডিআর -এর একটি ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার নির্মাণের নামে ৪৫ একর জমি জবর দখলের হুকুম নামা জারী করেছে। গত ৩১ মার্চ খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক জমির মালিকদের প্রতি এই ভূমি হুকুম দখল নোটিশ দেন। নোটিশের স্মারক নম্বরগুলো হলো ১৪-২১/০৫-৬১ এল, এ; ৬২/এল.এ; ৬৩/এল.এ; ৬৪/এল.এ; ৬৫/এল.এ; ৬৬/এল.এ; ও ৬৭/এল.এ।

সব ক'টি নোটিশের ভাষা হুবহু একই। এতে বলা হয়েছে "যেহেতু নিম্নবর্ণিত তফশীলভুক্ত ভূমি জনস্বার্থে বাবুছড়া রাইফেলস (বিডিআর) ব্যাটালিয়ন স্থাপন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন, সেহেতু আপনাকে জানান যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি অধিগ্রহণ রেগুলেশন, ১৯৫৮ ইং মোতাবেক অদ্য ৩১/৩/০৫ ইং তারিখ হইতে অধিগ্রহণ করা হইল। উক্ত তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট ভূমি সকল প্রকার দায়মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল। উক্ত ভূমির ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।"

সরকার কোন পক্ষের সাথে কোন রূপ আলোচনা না করে এক তরফাভাবে উক্ত জমি জবরদখলের সিদ্ধান্ত নেয়। এতে কেবল উক্ত জমির মালিকরা নয়, পুরো এলাকার জনগণ চরমভাবে অতিষ্ট ও বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। কারণ সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে তিনটি গ্রাম যেমন যদু ধন কার্বারী পাড়া, গোবিন্দ কার্বারী পাড়া ও হেঙোত্যা কার্বারী পাড়ার ৭৪টি পরিবার তাৎক্ষণিকভাবে উচ্ছেদ হবে। তাছাড়া, হেডকোয়ার্টারটি নির্মিত হয়ে গেলে আশেপাশের অন্ততপক্ষে আরো একশ পরিবার উচ্ছেদের সম্মুখীন হবে। এই পরিবারগুলো ১৯৬০ দশকে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কারণে একবার ক্ষতিগ্রস্ত ও উচ্ছেদ হয়েছিলেন। এরপর ১৯৮৬ সালে সেনাবাহিনীর অত্যাচার ও নির্যাতনের ভয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী হয়েছিলেন। এর ফলে এই পরিবারগুলো অর্থনৈতিকভাবে এমনিতেই পঙ্গু হয়ে আছে। তার উপর যদি আবার উচ্ছেদ হতে হয়, তাহলে তাদেরকে পথে বসতে হবে।

সরকার ক্ষতিপূরণের কথা বললেও তা লোকদেখানো মাত্র। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির সংকট প্রকট। ক্ষতিপূরণ হিসেবে কয়েক হাজার বা দু এক লাখ টাকা দিয়ে তারা কিছুই করতে পারবেন না। এ জন্য জমির মালিকরা জমি ছাড়তে নারাজ। তারা এই জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করেছেন। গত ২৩ মে হাইকোর্ট সরকারের উক্ত ভূমি হুকুম দখলের নোটিশের বিরুদ্ধে স্টে অর্ডার দিয়েছে (অর্থাৎ মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নোটিশ কার্যকর হবে না) এবং কেন উক্ত নোটিশসমূহ বাতিল করা হবে না এই মর্মে সরকারের উপর রুলনিশি জারী করেছে। হাইকোর্টে আরো শুনানী চলবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দ ও এলাকার লোকজন মনে করেন, পাহাড়িদের নিজ জায়গা জমি থেকে উৎখাত করার লক্ষ্যেই ভূমি জবর দখলের নোটিশ দেয়া হয়েছে। বিডিআর-এর ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার নির্মাণ একটি অজুহাত মাত্র। কারণ ঐ এলাকা থেকে নিকটবর্তী আন্তর্জাতিক সীমান্ত উত্তরে ৪০ কি ৫০ মাইল দূরে। খাগড়াছড়িতে বিডিআর-এর একটি হেডকোয়ার্টার ইতিমধ্যে রয়েছে। এছাড়া রয়েছে অসংখ্য ক্যাম্প। সর্বোপরি প্রস্তাবিত হেডকোয়ার্টার এর পাশেই রয়েছে একটি আর্মি ক্যাম্প, যারও কোন প্রয়োজন সেখানে নেই। এই সেনা ক্যাম্পটিও জনগণের জন্য হুমকি স্বরূপ। গত ১৯৯৯ সালের ১৬ অক্টোবর এই ক্যাম্পের সেনারা বাবুছড়ায় ৪ জনকে হত্যা করে ও বেনুবন বৌদ্ধ বিহারে হামলা চালায়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রত্যেকটি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন অজুহাতে ভূমি বেদখল করে চলেছে। কখনো বনায়নের নামে, সেনা ক্যাম্পের নামে, কখনো উন্নয়নের অজুহাতে আবার প্রায়শ জমির দলিলপত্র জালিয়াতি করে বিভিন্নভাবে ও প্রক্রিয়ায় পাহাড়িদের জমি জবর দখল করা হচ্ছে। সেটেলারদের নিয়ে আসার ফলে ফেনি অঞ্চল, বান্দরবানের রুমা, আলিকদমসহ পাহাড়িদের বিস্তীর্ণ এলাকা পুরোপুরি বেদখল হয়ে গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশাল সেনা মোতায়েন রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামকে সম্পূর্ণ বাঙালীকরণ করা, সেটেলারদের নিরাপত্তা দেয়া ও পাহাড়িরা যাতে কোন ভাবেই এর প্রতিবাদ করতে না পারে তার ব্যবস্থা অর্থাৎ দমন করা।

বর্তমানে জমি জবরদখল কেবল খাগড়াছড়িতে নয়, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটিতেও সরকার বিভিন্ন অজুহাতে জমি অধিগ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। সেনাবাহিনীই প্রধানত জমি জবরদখলের জন্য দায়ি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ সরকারের অন্যায়ভাবে জমি জবর দখল মেনে নেবে না। অনেক হয়েছে। জোর জুলুম অন্যায় অত্যাচার অনেক হয়েছে। জনগণের পিট দেয়ালে ঠেকেছে। আর সহ্য করা নয়। এবার নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, নিজেদের জমির জন্য মরণ পণ লড়াই করতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ প্রস্তুত।

সরকারকে অবিলম্বে বাবুছড়ায় জমি জবর দখলের নোটিশ বাতিল করতে হবে। বান্দরবানে সেনাবাহিনীর জন্য বেদখলকৃত জমিও ফেরত দিতে হবে। বেদখলকৃত পাহাড়িদের সকল জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। দাবি

ঘিলাছড়িতে সেনারা কিয়ঙে মাইক বাজানোর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে

স্বাধিকারের গত সংখ্যায় (৩২তম) এই মর্মে একটি রিপোর্ট ছাপা হয় যে, রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচর থানার ঘিলাছড়ি ক্যাম্পের কমান্ডার সেকেন্ড লেপ্টেন্যান্ট মাসুদ ঘিলাছড়ি বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষকে ডেকে বিহারে মাইক না বাজানোর নির্দেশ দেন।

স্বাধিকার উক্ত সংখ্যার সম্পাদকীয়তে এই ঘটনার প্রতি সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

বর্তমানে সেনা কমান্ডারের উক্ত নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে বলে কুদুকছড়িতে অবস্থিত ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের রাঙ্গামাটি জেলা অফিস থেকে স্বাধিকারকে জানানো হয়েছে।

"মাস্তানী করবো শুধু আমি"

বর্মাছড়িতে ক্যাপ্টেন তারেক এখন একটি ভয়ংকর নাম। তিনি খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি জোনের অধীন শুকনাছড়ি আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডার (২৪ ফিল্ড আর্টিলারী)।

গত ৭ জুন তিনি বর্মাছড়ি বাজারে এলাকার মুরুব্বীদের নিয়ে একটি মিটিং ডাকেন। সেখানে তিনি বলেন, "এখানে কোন মাস্তানী করা যাবে না। কেউ মাস্তানি করতে পারবে না। মাস্তানী করবো শুধু আমি। তোমরা মাস্তানি কর তখন, যখন পূর্ণস্বায়ত্তশাসন পাবে। আমাকে চিনেন তো আমার নাম ক্যাপ্টেন তারেক।"

উক্ত মিটিঙে উপস্থিত একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি স্বাধিকার প্রতিবেদককে উক্ত কথাগুলো বলেছেন।

উক্ত জনপ্রতিনিধি আরো বলেন, ক্যাপ্টেন তারেক আসার পর এলাকায় সেনা অপারেশন, লোকজনকে হয়রানি, হুমকি ধামকি দেয়া ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ গ্রামবাসীদের সব সময় আতঙ্কে থাকতে হয়।

তিনি বলেন, ক্যাম্প কমান্ডাররা প্রায় সময় বদলী হয়। কখন কোন ধরনের কমান্ডার আসে ঠিক নেই। অনেক কমান্ডার তুলানমূলকভাবে ভালো। তাদের সাথে অন্তত কথাবার্তা বলা যায়। আবার অনেক কমান্ডার এত বদমায়েশ যে নুন্যতম আদব কায়দা ও সৌজন্যবোধটুকু পর্যন্ত এদের জানা নেই। লোকজনের সাথে এরা খুব খারাপ ব্যবহার করে। সাধারণ লোকজনকে তারা মানুষ বলেও গণ্য করে না।

গত ২ জুন ক্যাপ্টেন তারেক তার ১৮-১৯ জন সৈন্য নিয়ে বর্মাছড়ি ইউনিয়নের কলাছড়ি পাড়ার কয়েকটি বাড়িঘরে তল্লাশি চালায়। জিজ্ঞাসাবাদের নামে বাড়ির লোকজনকে হয়রানি করে ও ৩ নিরীহ গ্রামবাসীকে মারধর করে।

জোন কমান্ডারের অত্যাচারে লক্ষ্মীছড়ি জনগণ অতিষ্ঠ

অংসাচিং, *লক্ষ্মীছড়ি থেকে*

খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল মোঃ আব্দুল মোমিন খানের অত্যাচারে এলাকার পাহাড়ি বাঙালী সবাই অতিষ্ঠ। থানার প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ, ব্যবসায়ীদের হয়রানি, রাজনৈতিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ, মুরুব্বী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে হেয় মনে করে তাদের সাথে যা ইচ্ছে তাই ব্যবহার করা এখন তার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়াও সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার নির্যাতনের তো কোন শেষ নেই।

গত ১৮ এপ্রিল তিনি এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে "জরুরী" সভা ডাকেন। কার্বারী, হেডম্যান, মেম্বার, চেয়ারম্যান ও মুরুব্বীদের চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু সভায় হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া আমন্ত্রিতদের অধিকাংশ অনুপস্থিত থাকেন। এতে জোন কমান্ডার রেগে যায়। সভায় তিনি আবোল তাবোল বকতে থাকেন এবং মেম্বার, চেয়ারম্যান, কার্বারী ও হেডম্যানদের সম্মানী ভাতা বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেন। তিনি ইউপিডিএফ-এর ওপরও একচোট নেন এবং পার্টিকে সহযোগিতা না দেয়ার জন্য সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে হুঁশিয়ার করে দেন। কেউ সহযোগীতা করেছে বলে প্রমাণ পেলে তিনি তাকে জেলে ঢুকিয়ে দেবেন বলে সতর্ক করে দেন।

এলাকার লোকজনের সাথে আলাপ করে জানা গেছে বেশ কয়েকটি কারণে তারা কমান্ডারের উক্ত মিটিং বয়কট করেছেন। প্রথমত, জোন কমান্ডার সাম্প্রদায়িক। তিনি পাহাড়িদের বাঁকা চোখে দেখেন। বিভিন্নভাবে তাদের হয়রানি ও মিথ্যা মামলা সাজিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেন। দ্বিতীয়ত, তিনি এলাকার হাট বাজারে গাছ-বাঁশ বেচা কেনার ওপর হস্তক্ষেপ করেন। বর্তমানে লক্ষ্মীছড়ি বাজারে গাছ-বাঁশ বেচা কোন বন্ধ। এতে এলাকাবাসীর ভোগান্তি বেড়েছে। কারণ এলাকার জনগণের জীবিকা মূলত গাছ বাঁশের ওপর নির্ভরশীল। এখানে ধান্য জমি নেই বললেই চলে। তৃতীয়ত, পথে ঘাটে যেখানেই পান তিনি পাহাড়ি যুবকদের হয়রানি করে ছাড়েন। তাছাড়া জোন কমান্ডারের ব্যবহার অত্যন্ত রূঢ়। এসব কারণে মুরুব্বীরা তার সভা বয়কট করেন।

মুদি দোকানদারকে মারধর

গত ২২ মে জোনের সেনা সদস্যরা লক্ষ্মীছড়ি বাজারের মুদি দোকানদার রতন কান্তি নাথ ও তার ছোট ভাই খোকন কান্তি নাথকে তার দোকানে ঢুকে মারধর করে। সেনারা দোকানের সমস্ত মালামাল - চাল, ডাল, আলু, চিনি, মরিচ, লবণ, পেঁয়াজ, হলুদ ইত্যাদি মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। মারধর করে দুই ভাইকে উলঙ্গ অবস্থায় রেখে দেয়। পরে তাদেরকে সেনাদের ব্যবহারকারী গাড়িতে করে জোনে নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার সময় সেনারা দোকানের ক্যাশ বাক্সটিও নিয়ে যায়।

এর আগে একবার জোন কমান্ডার রতন কান্তি নাথকে জোনে নিয়ে গিয়ে মারধর করেছিলেন।

লক্ষ্মীছড়ি দোকানদার ও ব্যবসায়ীরা যাতে এইসব ঘটনার প্রতিবাদ করতে না পারে সেজন্য জোন কমান্ডার হুমকি ও ভয় ভীতি দেখাচ্ছে। কেউ এ ব্যাপারে কোন কথা বললে তার পরিণতিও রতন কান্তি নাথের মতো হবে বলে হুমকি দিচ্ছে।

মরাচেঙ্গীতে তল্লাশী ও নির্যাতন

গত ২৬ মে লক্ষ্মীছড়ি জোনের সেনারা মরাচেঙ্গী পাড়ায় হিরেন্দ্র চাকমার বাড়িতে হানা দিয়ে তল্লাশী চালায়। সেনারা অবৈধ কোন কিছু উদ্ধার করতে না পেরে ফেরার পথে পাড়ার কয়েক জন যুবককে জোনে ধরে নিয়ে যায়। ধৃতদের পরিচয় জানা গেছে। এরা হলেন কিরেন্দ্র চাকমা, পোরোল চাকমা, জোয়াইজ্যা চাকমা, হৃদয় চাকমা, ও দয়া চাকমা। পরে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলেও, সপ্তাহে ৩/৪ বার জোনে গিয়ে হাজিরা দিতে হচ্ছে। জোন কমান্ডার হৃদয় চাকমার কাছ থেকে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন সেটটি কেড়ে নেন।

সেনারা ঐদিন মরাচেঙ্গী পাড়া বৌদ্ধ বিহারে জুতা পায়ে প্রবেশ করে বিহারের পবিত্রতা নষ্ট করে। বর্তমানে পথে ঘাটে গণহারে জিজ্ঞাসাবাদ, বডি চেক সহ লোকজনের ওপর সেনা হয়রানি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাঁশ গাছ আটক

২২ মে লক্ষ্মীছড়ি জোনের অধীন বান্যাছোলা আর্মি ক্যাম্পে সেনারা ব্যবসায়ীদের কেনা বাঁশ ও গাছ আটকিয়ে রাখে। তারা কয়েকজন ব্যবসায়ী ও নিরীহ দিন মজুরকেও মারধর করে।

নতুন ক্যাম্প স্থাপন

লক্ষ্মীছড়ি থানার শুকনাছড়ি মোনতলাতে একটি নতুন আর্মি ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে। আশেপাশের লোকজনকে ক্যাম্প নির্মাণের জন্য বিনা পয়সায় গাছ বাঁশ দিতে হয়েছে।

মুন্সি মিঞার ওপর শারীরিক নির্যাতন

৩১ মে লক্ষ্মীছড়ি জোনের অধীন বান্যাছোলা ক্যাম্পের কমান্ডার মানিকছড়ি থানার বোলাছোলা গ্রামের মোঃ মুন্সি মিঞার ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালায়। এতে তার একটা হাত ভেঙে যায়।

জানা গেছে, মুন্সি মিঞার সাথে একই পাড়ার রোকেয়া বেগমের জমি সংক্রান্ত বিরোধ চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। এ ব্যাপারে এখনো আদালতে বিচার চলছে। রোকেয়া বেগম ক্যাম্পে গিয়ে মুন্সি মিঞার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করলে এতে সেনারা মুন্সি মিঞার ওপর ক্ষেপে যায়।

ইউপিডিএফ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের কারণে হয়রানি

গত ৭ জুন খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ আহুত ভূমি বেদখল বিরোধী সমাবেশে অংশগ্রহণের কারণে লক্ষ্মীছড়িতে লোকজনকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। জোন কমান্ডার ঐ সমাবেশে লক্ষ্মীছড়ি থেকে কারা কারা অংশগ্রহণ করেছে তার তালিকা তৈরি করছে। পরে তাদের ওপর নির্যাতন হয়রানি করা হতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

গুইমারা ব্রিগেড সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা চালাচ্ছে সেনাবাহিনী

খাগড়াছড়ির গুইমারা এলাকায় অবস্থিত সেনা ব্রিগেড সম্প্রসারণের জন্য রামগড় থানাধীন হাফছড়ি ইউনিয়নের ২০৯ নং বড় পিলাক মৌজার স্থানীয় পাহাড়ি ও অপাহাড়ি লোকজনের প্রায় ৪ একর ধান্য জমি ও পাহাড়ের ভূমি দখলিস্বত্ব ছেড়ে দিতে বলেছে সেনাবাহিনী।

স্থানীয় লোকজন থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, সেনাবাহিনী এ মাসে এলাকার স্থানীয় লোকজনকে আগামী ১১ মাসের মধ্যে তাদের ভূমির দখল ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বলেছে। এর ফলে লোকজন বাস্তুভিটা হারাবার ভয়ে ও হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন।

জানা গেছে ব্রিগেড সম্প্রসারণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হলে এলাকার পাহাড়ি ও অপাহাড়ি (বাঙালী) মিলে প্রায় ৩ শত পরিবার তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ হবেন।

সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ■ ৩০ জুন ২০০৫ ■ বুলেটিন নং ৩৩

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে

গত ৮ জুন খাগড়াছড়িতে বিচারপতি এ এম মাহমুদুর রহমানের সভাপতিত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন প্রথমবারের মতো বৈঠকে বসে। ১৯৯৯ সালের ৩রা জুন এই কমিশন গঠিত হলেও এখনো পর্যন্ত কোন কার্যক্রম শুরু করেনি।

এই বৈঠকের একদিন আগে পার্টির উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে হাজার হাজার নারী পুরুষের মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সরকার-সেনাবাহিনী ও জনসংহতি সমিতির মিলিত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে সমাবেশ সফল হওয়ায় যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে তা হলো ভূমি অধিকার প্রশ্নে জনগণ অত্যন্ত সচেতন এবং তারা এ অধিকার আদায় ও রক্ষার জন্য যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত। সুতরাং সেই হিসেবে ভূমি বেদখল বিরোধী মহাসমাবেশে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও দৃপ্ত অংশগ্রহণ সরকার ও কুচক্রী মহলের প্রতি একটি সতর্ক সংকেত: নানা উছিলায় জনগণের জমি কেড়ে নেয়া যাবে না, ভূমি সমস্যা সমাধানের নামে কোন ধরনের টালা বাহানাও সহ্য করা হবে না।

সন্দেহ নেই, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা কিছুটা জটিল। জটিল হওয়ার কারণ প্রধানত দুইটি। এক, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষ অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও এবং এখানকার জাতিসত্তাসমূহের স্বতন্ত্র ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবনাচার সত্ত্বেও, পাহাড়িদের সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসা ভূমির ওপর যৌথ মালিকানার স্বীকৃতি না দেয়া। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে কেবল তিন ধরনের মালিকানার কথা বলা হয়েছে, যেমন রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা। সংবিধানে যেমন দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর স্বীকৃতি নেই, তেমনি তাদের বিশেষ ভূমি মালিকানা পদ্ধতিরও কোন রক্ষাকবচ নেই। এর ফলে জাতিসত্তাগুলোর বংশ পরম্পরায় চলে আসা যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তি দেশের আইন দ্বারা সংরক্ষিত না হওয়ায় সেগুলো খাস জমি হিসেবে আখ্যায়িত করে সরকার এবং বহিরাগতদের দ্বারা প্রশাসনের সহায়তায় বেদখল করা সহজতর হয়েছে। বৃটিশ আমল থেকেই এই ধারা চলে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপনিবেশ স্থাপনের পর বৃটিশরাই প্রথম নিজেদের স্বার্থে ব্যক্তি মালিকানা প্রথার প্রবর্তন করে ও একই সাথে ব্যাপক বনাঞ্চল নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেয়।

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ হবে পাহাড়ি জাতিসত্তাগুলোর যৌথ মালিকানার স্বীকৃতি দেয়া।

দ্বিতীয় যে পদক্ষেপ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সহ সকল ক্ষেত্রে সমস্যার জন্ম দিয়েছে তা হলো জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সরকারী উদ্যোগে অস্ত্র ক্ষমতার বলে কয়েক লক্ষ সমতলবাসী বাঙালীকে পুনর্বাসন। এর ফলে একদিকে যেমন মানবাধিকার পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়, অন্যদিকে তেমনি পাহাড়িদের নিজ জমি থেকে উৎখাত হওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং পাহাড়িদের পুরো জাতীয় অস্তিত্ব সাক্ষাত হুমকির মুখে পতিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সেটলারদের অনুপ্রবেশের আগেই ৬০ দশকে কাপ্তাই বাঁধে ৫৪ হাজার একর জমি পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় চাষযোগ্য জমির অপ্রতুলতা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। তার উপর আরো চার লক্ষ বাঙালীকে রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিয়ে আসায় পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যৌথ মালিকানার স্বীকৃতির সাথে সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন অত্যন্ত জরুরী। এটা হবে সবার জন্য মঙ্গলজনক।

রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা থাকলে এইসব ষড়যন্ত্রের শিকার গরীব সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন করা কোন সমস্যা হতে পারে না। ফিলিস্তিনীদের গাজা উপত্যাকা থেকে ৪০ বছর পর ইহুদী বসতিস্থাপনকারীদের সরিয়ে আনার শ্যারণের সিদ্ধান্ত সে কথাই প্রমাণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় এটা করা আরো বেশী সহজ। কারণ সেটলাররা নিজেরাই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, সরকার তাদেরকে যেখানে পুনর্বাসন করবে তারা সেখানেই যাবেন। তাছাড়া কয়েক বছর আগে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট তাদের সমতলে পুনর্বাসনের জন্য অর্থ সাহায্য দিতে রাজী হয়েছিল।

সেটলারদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যে কথা চরম দক্ষিণপন্থী মতবাদীদের কাছ থেকে বলা হয় তা হলো, বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। তাদের এই কথা অবশ্যই সত্য, কিন্তু যুক্তি হিসেবে তা অবান্তর। পৃথিবীর অনেক দেশ রয়েছে যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব বাংলাদেশের মতোই। এমনকি বাহরাইনে জনসংখ্যার ঘনত্ব বাংলাদেশের চাইতে বেশী।

সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া হলে চরম দক্ষিণপন্থী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির দিক থেকে স্বাভাবিকভাবে কিছুটা প্রতিবাদ আসতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞা থাকলে সেটা মোকাবিলা করা অসম্ভব কিছু নয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো সেটলারদেরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার বন্ধ হবে এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো তাদের অস্তিত্বের হুমকি থেকে রক্ষা পাবে। অর্থনৈতিকভাবেও বাংলাদেশ লাভবান হবে। কারণ এতে করে সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাখার জন্য যে কোটি কোটি টাকার ফ্রি রেশন দেয়া হয় তা বেঁচে যাবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা জিইয়ে রাখার জন্য সামরিক খাতে দৈনিক বাড়তি যে দেড় কোটি টাকা খরচ হয়, তাও সাশ্রয় হবে। এছাড়া, পাহাড়ি বাঙালী সম্প্রীতি ফিরে আসবে এবং সরকার ও দেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হবে।

আমাদের প্রত্যাশা, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যার সমাধান তথা অত্র অঞ্চলে প্রকৃত শান্তি ও উন্নয়নের স্বার্থে উপরোক্ত বাস্তবসম্মত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবে। তা না হলে সমস্যা গভীর থেকে গভীরতর হবে যা কারোর কাম্য হতে পারে না।

সাবধান! দেশে এখন বেগম অরাজকতার সরকার!!

সত্যদর্শী

সৌজন্যে: সাপ্তাহিক হলিডে

এ হলো ভয়াবহ অরাজকতার কিছু স্ন্যাপ শট মাত্র। বেগম অরাজকতার রাজত্বের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে গেলে কয়েকটি মহাকাব্য লেখা যাবে।

দেশে এখন কার সরকার ক্ষমতায় আসীন? যারা সিনিক বা নিরাশাবাদী তারা বলবেন দেশে এখন কোন সরকার ক্ষমতায় নেই। দেশে এখন যা চলছে বা যেভাবে দেশ চলছে তাতে এরকম মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু আমার মতে তাদের এ কথা সত্য নয়। দেশে অবশ্যই একটি সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। আর তা হলো বেগম অরাজকতার জোট সরকার।

তো এ সরকারের রাজত্ব কি রকম? প্রথমেই স্মরণ করা দরকার সত্তর দশকের মধ্যভাগে বেগম সাহেবার পুরুষ মানুষটি সেনানায়কের পোষাক ছেড়ে রাজনীতি করতে এসে কি বলেছিলেন। "*আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট*", বলেছিলেন তিনি। অবশ্য তিনি রাজনীতি কতটুকু ডিফিকাল্ট করতে পেরেছিলেন সেটার বিচার এই লেখার বিষয়বস্তু নয়। তবে সে সম্পর্কে এটা বলা যায় জেনারেল সাহেব ষড়যন্ত্র চক্রান্ত ও হর্স ট্রেডিং এর মাধ্যমে বাম, মধ্য বাম, ডান ও চরম ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে সেখান থেকে লোক জড়ো করে নিজের পার্টি গঠন করেছিলেন। সেই পার্টিরই যোগ্য উত্তরাধিকারী হলেন জেনারেলের বেগম অরাজকতা, যার রাজত্বে এখন বাংলাদেশ চলছে।

নিজের স্বার্থে অন্যের পার্টি-সংসার ভেঙে দেয়ার যে ঐতিহ্য, বেগম অরাজকতা এখন তা রক্ষা করতে যেন উঠে পড়ে লেগেছেন। যেখানে জেনারেলটি পলিটিক্সকে ডিফিকাল্ট করতে চেয়েছিলেন, সেখানে একবিংশ শতাব্দীতে এসে তার বেগম যেন প্রতিজ্ঞা করেছেন: *আই উইল মেক পলিটিক্স ডার্টি*। অবশ্য পলিটিক্স ডার্টি করার খেলায় যিনি সবচেয়ে বেশী পারঙ্গম তিনি হলেন অন্য এক জেনারেল, যার নাম হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ। রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে জেনারেল এরশাদের কদর্য হাতের স্পর্শে কলুষিত হয়নি। এখন বেগম সাহেবা কদর্য রাজনীতির চর্চায় তার সাথে পাল্লা দিতে যেন শাড়ির আঁচল কোমড়ে বেঁধে নেমে পড়েছেন। বেগমের কদর্য রাজনীতির খেলার কেন্দ্রবিন্দুও হলেন স্বয়ং এরশাদ ও তার পরিবার। সুতরাং খেলা জমে ওঠাটা খুবই স্বাভাবিক।

যাই হোক, নোংরা রাজনীতির পঙ্কে এরা যত পারে ডুবে থাকুক। তাতে আপত্তি বিশেষ করার নেই। তবে বেগম অরাজকতার রাজত্বে দেশের কি অবস্থা সেটা একটু দেখা দরকার।

শীতল যুদ্ধের সময় আমেরিকার ধুরন্ধর পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি আখ্যা দিয়েছিলেন - এটা বহু পুরোনো কথা। এর মধ্যে বাংলাদেশের নদনদী দিয়ে অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। গরীব দেশটির মসনদে যারাই বসেছে তারাই দেশটাকে আখের রস মনে করে চিবিয়ে খেয়েছে। এই শাসকগুলোর গত ৩৫ বছরের রাজত্বে দেশটা একেবারে "ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া" হয়েছে। কেবল বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে পর পর তিন বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করেছে। মবুতুর কঙ্গোসহ (আগের নাম জায়ার) আফ্রিকার বেনানা রিপাবলিকগুলোর (Banana Republics) সাথেই কেবল বর্তমান বাংলাদেশের তুলনা চলে। দুর্নীতি দেশে এখন আইন দ্বারা স্বীকৃত। বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ আরো এক বছর বৃদ্ধি করার অর্থ কি এটা বোঝায় না? সুতরাং স্বাধীন দুর্নীতি কমিশন গঠন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক হাত দেখিয়ে নেয়ার জন্য দিনভর বাগাড়ম্বর সবই ভাওতাবাজি। যেখানে সর্ষের মধ্যে ভূত, সেখানে কোন মন্ত্রজপ অর্থহীন প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুর্নীতি কেবল যে গভর্ণেন্স বা প্রশাসন কার্যক্রমের মধ্যে সীমিত তা নয়। যেখানে দুর্নীতি শাসকগোষ্ঠিগুলোর কালচারে পরিণত হয়েছে, সেখানে তা সমাজ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে ঢুকে পড়বে সেটাই তো স্বাভাবিক। শাসকগোষ্ঠির সংস্কৃতিই সমাজের প্রভাবক সংস্কৃতি। সুতরাং ব্যবসা বাণিজ্য থেকে নিয়ে দৈনন্দিন ছোট খাট লেনদেনের মধ্যেও অসততা ও অসাধুতা এখন যেন প্রভাতে সূর্য ওঠার মতোই স্বাভাবিক ও শ্বাশ্বত। ভোগ্য পণ্যে ভেজাল মেশানোর খবর হরহামেশা পত্রিকায় ছাপা হয়। দেশে এখন এমন কোন জিনিস নেই যেটাতে ভেজাল মেশানো হয় না। এমনকি যেটা না হলে চলে না সেই চাল পর্যন্ত দুই নাম্বারী করা হয়েছে। ইউরিয়া সার মিশিয়ে চাউল সাদা করা হচ্ছে। এছাড়া, নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য যেমন ডাল, লবন, চিনি, গুড়া মরিচ, তেল ইত্যাদিতে ভেজাল মেশানো হচ্ছে অহরহ। শাক সব্জি, কাঁচা তরিতরকারী ও ফলমূলেও রয়েছে ভেজাল। দেশে অনেকে খাদ্য খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছে, খাদ্য খেয়েও মারা যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ সত্যি এখন বসবাসের জন্য বিপজ্জনক।

যাই হোক, ভেজাল খাদ্য খেয়ে না হয় তেমন কিছুই হলো না। কারণ গরীবের পেটে অনেক কিছু হজম হয়। কিন্তু তাই বলে কি বিপদমুক্ত থাকা গেল? ঢাকার রাস্তায় চলাফেরা করাটাও এখন কম বিপজ্জনক নয়। গত ২৮ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী সাম্মি আখতার হ্যাপির গাড়ি চাপায় করুণ মৃত্যু ও তার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এলাকায় পুলিশের বর্বরতা তার সাক্ষী। পুলিশ কেবল ছাত্রছাত্রীদের পেটায়নি, পথচারীদেরও রেহাই দেয়নি। পরে ভিসির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর ছাত্রদলের কর্মিরাও চড়াও হয়। পুলিশের সহায়তায় ছাত্রদল পুরো ক্যাম্পাস দখল করে নেয়।

নৈরাজ্য কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নয়, সর্বত্র। ফুটপাত থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় হাইকোর্ট পর্যন্ত। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থিত আইনজীবীদের মধ্যে উত্তেজনা, বার কাউন্সিল ও সুপ্রীম কোর্টের মধ্যে দ্বন্দ্ব, আদালত বর্জন, আদালত প্রাঙ্গনে সভাসমাবেশের ওপর কোর্ট রুলিং ইত্যাদিতে হাইকোর্ট প্রাঙ্গন বেশ কিছুদিন ধরে ছিল উত্তপ্ত।

অপরদিকে, র‍্যাবের ক্রসফায়ারের কিস্সা-কাহিনী প্রতিদিন সংবাদ পত্রের পাতায় বিরামহীনভাবে ছাপা হচ্ছে। কথিত ক্রসফায়ার ও হেফাজতি খুন দেশ বিদেশের মানবাধিকার সংগঠন, রাজনৈতিক দলসহ সকল মহল ও এমনকি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশের কূটনীতিকদের অব্যাহত কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার নির্বিকার। সারা দেশে যেন জঙ্গলী রাজত্ব কায়েম হয়েছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আইনী ব্যবস্থায় একটি অন্যতম স্তম্ভ হলো প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তকে নির্দোষ মনে করা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ক্রসফায়ার খোদ এই আইনী প্রবাদটির মূলেই আঘাত হেনেছে। বিচারের আগেই অভিযুক্তকে "সন্ত্রাসী" বলে রায় দিয়ে ক্রসফায়ারের নামে ফাঁসি দেয়া হচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, সন্ত্রাস দমন নয়, বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মিদের শায়েস্তা করাই র‍্যাব গঠনের উদ্দেশ্য। কারণ ইতিমধ্যে অনেক রাজনৈতিক নেতা কর্মি ও এমনকি সাধারণ লোকজন পর্যন্ত র‍্যাবের হাতে খুন হয়েছেন।

এদিকে যারা প্রাণে বেঁচে আছেন তাদের অবস্থাও যেন "মরণ হলেই বাঁচি।" নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দফায় দফায় বেড়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির পর এক দফা ও সংসদে বাজেট পেশের পর আরো এক দফা - মোট দু' দফা বাড়লো। এ বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি জখম হয় গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো। এখন বর্ষাকাল। প্রতি বছরের মতো বন্যা হলে জিনিসপত্রের দাম যে আরো এক দফা বেড়ে যাবে সেটা সবার হিসেবের মধ্যে। দ্রব্য মূল্যের এ লাগামহীন উর্ধ্বগতিতে সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

এ হলো ভয়াবহ অরাজকতার কিছু স্ন্যাপ শট মাত্র। বেগম অরাজকতার রাজত্বের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে গেলে কয়েকটি মহাকাব্য লেখা যাবে। ■

যুদ্ধাপরাধ কি?

মাল্যা, লোগাং, লংগদু, নান্যাচরসহ অসংখ্য গণহত্যা কি আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধাপরাধ নয়?

তারিক কাফালা
বিবিসি নিউজ অনলাইন

হেগে যুগোশ্লাভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোচেভিক ও যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত অন্যান্যদের যে বিচার চলছে তাকে আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক বিচার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কিন্তু যুদ্ধাপরাধ বলতে আসলে কি বোঝায়? এর সাথে কোন আইনের সম্পর্ক রয়েছে এবং কে এই ধরনের অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করতে পারে?

যুদ্ধাপরাধ হলো একটি সাম্প্রতিক ধারণা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সাধারণভাবে মেনে নেয়া হতো যে যুদ্ধের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে যুদ্ধের বিভৎসতা। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন - বিশেষত নাৎসী জার্মানী কর্তৃক ইহুদী নিধন - এবং জাপানীদের হাতে বেসামরিক ব্যক্তি ও যুদ্ধ বন্দীদের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা মিত্র শক্তিকে এই সব অপরাধের জন্য দায়ি ব্যক্তিদের বিচার ও শাস্তি প্রদানে বাধ্য করেছে। ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে নুরেমবার্গ বিচারে ১২ জন নাৎসি নেতার ফাঁসি হয়। একই ধরনের একটি প্রক্রিয়া ১৯৪৮ সালে টোকিওতে শুরু হয়। সাত জাপানী কমান্ডারকে ফাঁসি দেয়া হয়, তবে মিত্র শক্তি সম্রাট হিরোহিতোকে বিচারের কাঠগড়ায় নিয়ে না আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

হেগে ট্রাইবুনালে যে সমস্ত মামলার শুনানী চলছে সে সব মামলার সামনে কেবলমাত্র উক্ত বিচারগুলোই হলো নজীর।

তাছাড়া, যে সব ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র মনে করেছে যে ন্যায় বিচার করা হয়নি সে সব ক্ষেত্রে সে সব রাষ্ট্রগুলো আলাদাভাবে নিজেদের উদ্যোগে বিচার করেছে।

এটা চমৎকারভাবে ঘটেছে ১৯৬০ সালে যখন ইসরায়েলী এজেন্টরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প গঠন ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের সাথে সরাসরি যুক্ত একজন উচ্চপদস্থ নাৎসী নেতাকে আর্জেন্টিনায় খুঁজে বের করে। তাকে অপহরণ করে ইসরাইলে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তার বিচার ও পরে ফাঁসি দেয়া হয়।

এ সম্পর্কিত সর্বসাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হলো ১৯৮৭ সালের ক্লজ বারবি'র বিচার। ইনি হলেন ফ্রান্সে জার্মান দখলের সময়কার একজন নেতৃস্থানীয় নাৎসী নেতা। তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়।

আইনসম্ভার

যুদ্ধাপরাধ ধারণার মূলে যে ভাবধারাটি রয়েছে তা হলো কোন একটি দেশের বা রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর কার্যকলাপের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে দায়ি করা যাবে। গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, যুদ্ধের সময় বেসামরিক ব্যক্তি কিংবা যোদ্ধার সাথে অন্যায্য আচরণ - এ সবই যুদ্ধাপরাধের পর্যায়ে পড়তে পারে। গণহত্যা হলো এই সব অপরাধসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ।

যে আইনসমূহ যুদ্ধাপরাধকে সংজ্ঞায়িত করে সেগুলো হলো জেনেভা কনভেনশনসমূহ। এগুলো হলো প্রাচীন ও বিস্তৃত আইনগুচ্ছ যাদেরকে যুদ্ধের আইন কানুন বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এছাড়া রয়েছে হেগে আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল ট্রাইবুনালের সংবিধি, যা সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৪৭ ধারায় যুদ্ধাপরাধকে নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

"Wilful killing, torture or inhuman treatment, including ... wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a protected person, compelling a protected person to serve in the forces of a hostile power, or wilfully depriving a protected person of the rights of fair and regular trial, ... taking of hostages and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly"

অর্থাৎ সুরক্ষিত কোন ব্যক্তিকে বেআইনীভাবে দেশত্যাগে বাধ্য করা অথবা স্থানান্তরিত করা অথবা বেআইনীভাবে আটকিয়ে রাখা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যন্ত্রণা দেয়া অথবা শরীরে কিংবা স্বাস্থ্যে মারাত্মকভাবে জখম করাসহ ইচ্ছাকৃত হত্যা, নির্যাতন অথবা অমানবিক ব্যবহার, কোন সুরক্ষিত ব্যক্তিকে শত্রু বাহিনীতে কাজ করতে বাধ্য করা অথবা তাকে ন্যায় বিচার থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত করা, ... পণবন্দী করা এবং সামরিক প্রয়োজনের দ্বারা যুক্তিযুক্ত নয় এমন ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও সম্পত্তির আত্মসাৎ যা বেআইনীভাবে ও বেপরোয়াভাবে করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞদের মতে এটাই হলো যুদ্ধাপরাধের মৌলিক সংজ্ঞা। হেগ ট্রাইবুনালের সংবিধি বলে যে, ১৯৯২ সাল থেকে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায় যে সব সন্দেহভাজন ব্যক্তি যুদ্ধের আইন ও রীতি লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে তাদের বিচার করার অধিকার আদালতের রয়েছে। ৩ নং ধারায় এ ধরনের লঙ্ঘনের উদাহরণ দেয়া হয়েছে:

বেপরোয়াভাবে নগর, শহর ও গ্রাম ধ্বংসকরণ অথবা সামরিক প্রয়োজনীয়তার দ্বারা যুক্তিযুক্ত নয় এমন ধ্বংসযজ্ঞ;

অরক্ষিত দালান অথবা আবাসগৃহ, গ্রাম ও শহরের ওপর আক্রমণ অথবা বোমা বর্ষণ - তা যে উপায়ে করা হোক না কেন;

ধর্ম, দাতব্য, শিক্ষার এবং শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের জন্য উৎসর্গীত প্রতিষ্ঠান, ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ এবং শিল্পকর্ম ও বিজ্ঞানকর্ম কুক্ষিগত করা, ধ্বংস করা অথবা সেগুলোর ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধন;

সরকারী ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির লুটপাট।

ট্রাইবুনাল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকে সশস্ত্র সংঘাতের সময় সংঘটিত কিন্তু বেসামরিক জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে পরিচালিত অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। ৫ নং ধারায় উদাহরণের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। যেমন: খুন, ধ্বংস, দাসবন্দী করণ, দেশান্তর, বন্দীকরণ, নির্যাতন, ধর্ষণ এবং রাজনৈতিক, জাতিগত ও ধর্মীয় কারণে নিবর্তন।

ট্রাইবুনাল গণহত্যাকে সংজ্ঞায়িত করেছে একটি জাতিগত, জাতিসত্তাগত, বর্ণগত কিংবা ধর্মীয় গোষ্ঠিকে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে সংঘটন করা কার্য হিসেবে।

তবে যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত আইন ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারিতে হেগের ট্রাইবুনাল এক রায়ে যুদ্ধের সময় সংঘটিত ব্যাপক ও গণ ধর্ষণ এবং যৌন দাসত্বকরণকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

এভাবে গণ ধর্ষণ বা যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত ধর্ষণকে যুদ্ধের নিয়মনীতি লঙ্ঘন থেকে একটি অন্যতম জঘন্য যুদ্ধাপরাধে উন্নীত করা হয়েছে, যার স্থান কেবল গণহত্যার পরেই।

যুদ্ধাপরাধ চিহ্নিতকরণ

যুদ্ধাপরাধ হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা সব সময় সহজ হয় না। শত্রু বাহিনী কর্তৃক বেসামরিক লোকজনকে তাদের বাড়িঘর থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়াকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না। এক্ষেত্রে এই যুক্তি দেয়া যেতে পারে যে বেসামরিক লোকদেরকে সরানো হচ্ছে তাদের রক্ষা করার জন্য। একে যুদ্ধাপরাধ বলে গণ্য করা হয় তখনই, যখন এই ধরনের বিতাড়নকে জাতি নিধন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অথবা বেসামরিক লোকদের জন্য গণ শাস্তি প্রদানের অভিসন্ধি হিসেবে প্রমাণ করা যায়।

একইভাবে বলতে গেলে, কোন একটি দেশের বিমান বাহিনী কর্তৃক প্রচার প্রপাগাণ্ডা চালানোর কারণে কোন শত্রুর টেলিভিশন কেন্দ্রে বোমা নিক্ষেপ করা কি যুদ্ধাপরাধ হবে? জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী এটা যুদ্ধাপরাধ নয়। কারণ যেভাবে কোন রাষ্ট্রের পরিকাঠামো যেমন রাস্তাঘাট, সেতু, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কারখানা ইত্যাদি সামরিক কাজে ব্যবহৃত হলে তা শত্রুবাহিনীর বৈধ লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকে, টেলিভিশন স্টেশনও তাই। এই ধরনের হামলা তখনই যুদ্ধাপরাধ হয়, যদি এই হামলার কারণে বেসামরিক লোকজনের ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা একই হামলা থেকে প্রাপ্ত সামরিক লাভের তুলনায় অতিরিক্তি হয়।

আন্তর্জাতিক আদালত

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ মোকাবিলার জন্য একটি একক বৈশ্বিক আইন ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছে। ১৯৯৩ সালের মে মাসে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার জন্য স্থাপিত আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত ছাড়াও, ১৯৯৪ সালে রুয়াণ্ডায় সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের বিচারের জন্য অন্য একটি আন্তর্জাতিক আদালত তানজানিয়ার আরুশায় গঠিত হয়েছে। হেগ ও আরুশার আদালত দুটি যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্তদেরকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলেও, নুরেমবার্গ ও টোকিওর মতো এই আদালতগুলোও কেবল সুনির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ বিচারের জন্য নিবেদিত।

২০০৩ সালের জুন পর্যন্ত ১৩৯টি দেশ আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালত গঠন সম্পর্কিত রোম চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ও ৯০টি দেশ তার অনুমোদন দিয়েছে (অর্থাৎ স্ব স্ব দেশে আইন পাস করে - অনুবাদক)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি স্বাক্ষরে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এই যুক্তিতে যে, এই আদালতকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আনীত মামলার পিছু নিতে ব্যবহার করা যাবে।

এই ধরনের আন্তর্জাতিক আদালত রাজনৈতিক কিনা - যেমনটা মিলোসেভিচ ও অন্যান্যরা বলছেন - সে প্রশ্ন সকল আন্তর্জাতিক আইনী প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর ঝুলছে। একভাবে বলতে গেলে এটা সত্য যে আদালতগুলো রাজনৈতিক, কারণ আদালতগুলোর কাজ শুরুর আগে সেগুলোর প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক যোগানদানের জন্য আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ইচ্ছার দরকার পড়ে।

আন্তর্জাতিক আদালতের সমালোচকরা প্রায়শ বলে থাকেন যে, আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার কেবলমাত্র তখনই সত্যিকার অর্থে বৈধ হতে পারে, যখন সকল যুদ্ধাপরাধকে - তা যে দেশই সংঘটিত করুক না কেন - একটি মাত্র আন্তর্জাতিক আদালতের এক্তিয়ারে নিয়ে আসা হয়।

-অনুবাদ স্বাধিকার

বলিভিয়ায় আদিবাসীদের নেতৃত্বে পরিচালিত গণআন্দোলনের আংশিক বিজয়

স্বাধিকার আন্তর্জাতিক ডেস্ক

কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকা গণ অভ্যুত্থানের মুখে গত ৯ জুন বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট কার্লোস মেসা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন বলিভিয়ার সুপ্রীম কোর্টের সভাপতি এডুয়ার্দো রদ্রিগেজ। দেশের আদিবাসী জনগণ, শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য এ এক বিরাট বিজয়।

বিক্ষোভকারীদের দুইটি প্রধান দাবি ছিল প্রাকৃতিক গ্যাসকে জাতীয়করণ করা ও সাংবিধানিক পরিষদের নির্বাচন দেয়া।

দক্ষিণ আমেরিকার মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা সিমন বলিভারের নামে রাখা বলিভিয়া দেশটি দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে হত দরিদ্র। প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদে ভেনেজুয়েলার পরই তার স্থান হলেও, ৯০ লক্ষ জনসংখ্যার দেশ বলিভিয়ায় ৩০ শতাংশ চরম দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করতে বাধ্য হন। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে বিদেশী কোম্পানীদের হাতে যেমন রেসপল, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম, টোটাল, এনরন, পেট্রোব্রাস ইত্যাদি। এই কোম্পানিগুলো গ্যাস সম্পদ আহরণ করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করলেও সাধারণ জনগণের জন্য কোন লাভ হয়নি। সেজন্য এবারের বিক্ষোভের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও এইসব বহুজাতিক কোম্পানিগুলো।

দেশের জনসংখ্যার ৬২ ভাগই হলেন আদিবাসী - যেমন আয়ামারা, কুয়েচুয়া ও গুয়ারানি জাতিগোষ্ঠি। দেশে এরাই হলেন সবচেয়ে দারিদ্র্যের শিকার এবং সেজন্য গণবিক্ষোভে তাদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বই ছিল প্রধান।

আসলে বলিভিয়ার জনগণ বহুদিন আগে থেকে ফুঁসে উঠছিলেন। গত ২০০৩ সালের অক্টোবরে প্রবল গণজোয়ারের মুখে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গনজালো সানচেজ দি লোজাদার সরকার উৎখাত হয়। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় পালিয়ে যান। তার সরকার গ্যাস সম্পদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করার পরিকল্পনা করলে জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। কারণ যেভাবে গ্যাস রপ্তানি করা হতো তাতে কেবল বহুজাতিক গ্যাস কোম্পানি ও সাম্রাজ্যবাদী সুপারপাওয়ারটিরই লাভ হতো। জনগণের কোন উপকার হতো না।

লোজাদার উৎখাতের পর ভাইস প্রেসিডেন্ট কার্লোস মেসা তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তেল ও গ্যাস শিল্পের ব্যাপারে গণভোট অনুষ্ঠান ও নতুন সংবিধান প্রণয়নের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু তাকেও প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মুখে পদত্যাগ করতে হলো।

২০০৫ সালের ২ মার্চ রাজধানী লা পাজের পার্শ্ববর্তী এলাকা এল আলটোর জনগণ এক সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন। পানীয় জলের বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ছিল এই ধর্মঘট। এল আলতোর ৯০ ভাগ জনসাধারণ হলেন আদিবাসী। তাদের বিক্ষোভের ফলে সরকার ফরাসী কোম্পানী Suez Lyonnaise des Eauxi- এর সাথে চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয়। এই চুক্তি কার্যকর হলে দুই লক্ষ লোক পানীয় জলের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন।

২০০০ সালে অন্য একটি বিক্ষোভ আন্দোলনও সাফল্য লাভ করে। মার্কিন কোম্পানি Bechtel দেশ থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়।

ল্যাতিন আমেরিকার অন্য প্রায় সবকটি দেশের মতো বলিভিয়াও সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় দালালদের দ্বারা বর্বর শোষণের শিকার। স্পেনের কোম্পানি রেসপল (Repsol/YPF) এর নির্বাহী প্রধান এ বছরের গোড়ার দিকে স্বীকার করেছেন যে, "বলিভিয়ায় তেল ও গ্যাস শিল্প খুবই লাভজনক - কারণ এক ডলার বিনিয়োগ করলেই ১০ ডলার উঠিয়ে আনা যায়।" তেল ও গ্যাস কোম্পানিগুলো বছরে ১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। অথচ তার বিপরীতে বলিভিয়ার সরকার ট্যাক্স হিসেবে পায় মাত্র ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তাছাড়া, উত্তোলন খরচ কম হওয়া সত্ত্বেও বলিভিয়ায় জ্বালানীর দাম আন্তর্জাতিক দামের চাইতে বেশী। দেশটির প্রচুর গ্যাস সম্পদ থাকা সত্ত্বেও বলিভিয়া ল্যাতিন আমেরিকায় দ্বিতীয় দরিদ্রতম দেশ (হাইতি হলো সবচেয়ে দরিদ্র)।

রাজধানী লা পাজে জনগণের বিক্ষোভ

২০০০ সাল থেকেই গণআন্দোলনের মুখে ইকুয়েডর, আর্জেন্টিনা ও বলিভিয়ায় বেশ কয়েকজন নব্য উদারনীতিবাদী সরকার প্রধানকে বিদায় নিতে হয়েছে। বলিভিয়ার বর্তমান আন্দোলনও ছিল প্রেসিডেন্ট মেসার নব্য উদারীকরণ নীতির বিরুদ্ধে। বিক্ষোভকারীরা "মেসা বাড়ি ফিরে যাও, জনগণের হাতে ক্ষমতা দাও" শ্লোগান দেয়। তাদের হাতে ছিল লাঠি ও চাবুক। এল আলটো থেকে প্রথম এই বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। তিন সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ চলার পর তা সাধারণ ধর্মঘটের আকারে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এতে কংগ্রেস, বিমান বন্দর, সেবা প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ মাধ্যম, বাজার অচল হয়ে যায়। সারা দেশ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ধর্মঘটের ফলে রাজধানী লা পাজ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, গ্যাস ও তেল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

সুপ্রীম কোর্টের প্রেসিডেন্ট এডুয়ার্দো রদ্রিগেজ প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেয়ার পরও সব ব্যারিকেড তুলে নেয়া হয়নি। আল আলটোর সংগ্রামী জনগণ প্রাকৃতিক সম্পদ জাতীয়করণ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। নতুন প্রেসিডেন্ট আল আলটোর নেতৃবৃন্দের সাথে কয়েক ঘন্টা ব্যাপী কথা বলেন। নেতৃবৃন্দ তাকে কিছু সময় দিয়েছেন। বলিভিয়া জনগণের বিদ্রোহ শেষ হয়ে যায়নি। বর্তমান সময়টা শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সাময়িক যুদ্ধবিরতি মাত্র। ■

দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ

সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে প্লাকার্ড হাতে প্রবাসী জুম্মরা ও কোরিয়ান ভভাকাঙ্ক্ষীরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন

সিউল প্রতিনিধি

গত ৫ জুন দক্ষিণ কোরিয়া প্রবাসী জুম্মদের সংগঠন জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক- কোরিয়া (জেপিএন-কে) ও কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। দিঘীনালার বাবুছড়ায় বিডিআর-এর ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার নির্মাণের নামে পাহাড়িদের ভূমি অধিগ্রহণ, ইউপিডিএফ এর ওপর রাজনৈতিক নিপীড়ন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। বিক্ষোভে খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ কর্তৃক আয়োজিত ৭ জুনের ভূমি বেদখল বিরোধী সমাবেশের সাথে সংহতি প্রকাশ করা হয়।

সমাবেশটি দুপুর ২টায় শুরু হলে জেপিএন-কে, মানবাধিকার সংগঠন PNAN, Korean House for international solidarity(KHIS) এর স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ এতে অংশ নেন। দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশটি আধা ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

পরে বিক্ষোভকারীরা প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন সহকারে সিউলের কূটনীতিক পাড়া ইটায়েওন এলাকা (Itaewon)প্রদক্ষিণ করে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জবরদখল, মানবাধিকার লঙ্ঘন, সেনা নির্যাতন ও ইউপিডিএফ নেতা-কর্মিদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেন।

জেপিএন-কে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রধান ফটকে একটি প্রতিবাদ লিপি রেখে আসে। সাপ্তাহিক ছুটির অজুহাত দেখিয়ে দূতাবাসের কোন কর্মকর্তা প্রতিবাদ লিপিটি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়।

উল্লেখ্য, কোরিয়া প্রবাসী জুম্মরা পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইউপিডিএফ-এর সাথে যোগাযোগের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সময় তারা সিউলে বিক্ষোভ ও অন্যান্য কর্মসূচীর আয়োজন করে থাকে। দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার সম্প্রতি তাদেরকে সে দেশে রিফিউজি মর্যাদা প্রদান করেছে।

জাতিসংঘের প্রতি এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস এর আহ্বান:

বাংলাদেশে বৈষম্যমূলক সাম্প্রদায়িক কর্মসূচীতে অর্থ সাহায্য দেবেন না

নতুন দিল্লী প্রতিনিধি

এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস গত জুন "কারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বৈষম্যমূলক বর্ণবাদে অর্থ সাহায্য দেয়?" শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টে দিল্লী ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠনটি অভিযোগ করেছে যে, বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ও বর্ণবাদী নীতি বাস্তবায়ন করছে। রিপোর্টে এই ধরনের বর্ণবাদী কর্মসূচীতে অর্থ সাহায্য না দেয়ার জন্য জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও দিপক্ষীয় দাতাদেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

এতে আরো বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার গত জুনের প্রথম সপ্তাহে নির্দেশ দিয়েছে যে, ১৯৭৮ সাল থেকে ২৮,০০০ সমতল থেকে আগত সেটলার পরিবারকে ফ্রি খাদ্য রেশন দেয়ার পাশাপাশি আরো "নতুন সেটলারকে" এভাবে ফ্রি খাদ্য রেশন দেয়া হোক। বাংলাদেশ - ভারত সীমান্তের কাছে রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক ইউনিয়নে বাঘাইহাট থেকে মাজালং পর্যন্ত এলাকায় আনুমানিক ৬৫ হাজার সেটলার পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১৯২৭ সালের বন আইন ও বাংলাদেশ বন আইন (সংশোধিত) ২০০০ লঙ্ঘন করে গহীন কাচালং রিজার্ভ ফরেস্টে বাঘাইহাট - সাজেক রাস্তা নির্মাণ করেছে এই সব সেটলারদেরকে নিরাপত্তা দেয়ার উদ্দেশ্যে।

সমতলী লোকজনদের সরকারী মদদপুষ্ট পুনর্বাসনের সাথে সমতালে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং বিশেষত: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক সামরিকায়ন প্রক্রিয়া চালু রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী রুমা ক্যান্টনমেন্ট সম্প্রসারণ, বাবুছড়ায় বাংলাদেশ রাইফেলস এর হেডকোয়ার্টার নির্মাণ, বান্দরবানের বালাঘাটায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার নির্মাণ ও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সুয়ালক ইউনিয়নে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ট্রেনিং সেন্টার ও একটি আর্টিলারী ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের জন্য হাজার হাজার একর জমি জোরপূর্বক জবরদখল করেছে। যে সব আদিবাসী জুম্ম এর ফলে উচ্ছেদ হয়েছেন তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি।

সংগঠনটির ডিরেক্টর সুহাস চাকমা বলেন, "কেবলমাত্র সেটলারদেরকে বিনামূল্যে খাদ্য রেশন দেয়া বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদ ও বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন মোতাবেক বর্ণ বৈষম্যের অপরাধের মধ্যে পড়ে। বাংলাদেশ এই কনভেনশনের স্বাক্ষরদাতা একটি দেশ।" তিনি বলেন, সেটলাররাই আদিবাসী জুম্মদেরকে তাদের জায়গাজমি থেকে উৎখাত করে ও তাদের অধিকার হরণ করে।"

এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস অভিযোগ করে যে, জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাগুলো এবং বিশেষত বিশ্ব খাদ্য সংস্থা গরীব জনগণকে সাহায্য দেয়ার নামে এই ধরনের কিছু কিছু কর্মসূচীতে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। জাতিসংঘের এজেন্সিগুলো ও দ্বিপক্ষীয় দাতাগুলো কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে যে অর্থ যোগান দেয় তা সেটলারদের খাতে ব্যয় করা হয়।

এসিএইচআর -এর উক্ত রিপোর্টটি নিম্নের ঠিকানায় ক্লিক করে পাওয়া যাবে:
www.achrweb.org/reports/bangla/BD01-05.pdf

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশন্যালের রিপোর্ট

স্বাধিকার আন্তর্জাতিক ডেস্ক

গত ২৫ মে লন্ডন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর তার বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও সম্প্রদায় সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়, হিন্দু ও আহমেদিয়া সম্প্রদায়সহ সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার জন্য শাস্তি হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে ২০০৩ সালে পাহাড়ি জনগোষ্ঠির ওপর সংঘটিত আক্রমণের কোন স্বাধীন তদন্ত হয়নি। এ আক্রমণে হত্যা, ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন ও শত শত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। এক আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা কিংবা বিদ্বেষমূলক শ্লোগান দেয়া বা আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদের ওপর আক্রমণের জন্য কাউকে বিচারের আওতায় আনা হয়নি। যদিও ২০০৩ সালে বাঁশখালী উপজেলায় একটি হিন্দু বাড়িতে অগ্নিসংযোগের দায়ে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, কিন্তু এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে যে আসল দোষীরা এদের মধ্যে নেই।

৩০০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই রিপোর্টে অভিযোগ করেছে য, বিশ্বের সরকারগুলো গত ২০০৪ সালে মানবাধিকারের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। সংগঠনটি বন্দী নির্যাতনের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে অভিযুক্ত করে।

রিপোর্টে বিশ্বের ১৩১টি দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর ব্যাপক পর্যালোচনা করে বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, তা অন্যান্য দেশের সরকারগুলোকে মানবঅধিকার লঙ্ঘনে উৎসাহিত করছে।

"পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্ণবৈষম্যে কারা অর্থ যোগান দেয়?" - ACHR রিভিউ

স্বাধিকার আন্তর্জাতিক ডেস্ক

দল্লী ভিত্তিক সংগঠন এশিয়ান সেন্টর ফর হিউম্যান রাইটস তাদের সাপ্তাহিক রিভিউতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলারদেরকে দেয়া সরকারের রেশনিং ব্যবস্থাকে বর্ণবৈষম্য বলে আখ্যায়িত করেছে এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, দাতা সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে তারা যেন তাদের দেয়া অর্থ সাহায্য সেটলারদের ফ্রি রেশনিং এ ব্যবহার করা হয় কিনা তা খতিয়ে দেখেন এবং এ ধরনের বর্ণবৈষম্য বন্ধে বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন।

রিভিউতে আরো বলা হয়, আদিবাসীদের মধ্যে কেবল ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদেরকেই রেশন দেয়া হয়, তবে তাও বৈষম্যমূলক। কারণ সরকার যেখানে প্রতি সেটলার পরিবারকে মাসিক ৮৫ কেজি চাল দেয়, সেখানে প্রত্যাগত শরণার্থীদের দেয়া হয় মাত্র ৬০ কেজি। কেবলমাত্র সেটলারদেরকে রেশন প্রদান বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদ এবং International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination -এর ১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। বাংলাদেশ এই কনভেনশনের স্বাক্ষরদাতা একটি দেশ।

রিভিউতে বলা হয়, ২০০১ সালে ওয়াদুদ ভূঁইয়া এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর সেটলার পুনর্বাসন গুণতক হারে বেড়েছে। ফ্রি রেশন দেয়ার উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন সময়ে চুপিসারে আসা সেটলারসহ সাজেক এলাকায় পুনর্বাসনের কার্যক্রম হাতে নেয়ার বৈধতা অর্জন করা। কারণ ১৯৮৩ সাল থেকে সরকারীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী পুনর্বাসন কার্যক্রম বন্ধ করা হয়।

এতে আরো অভিযোগ করা হয়, সরকার এইসব সেটলারদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য ব্যাপক সামরিকায়ন করছে। ১৯২৭ সালের বন আইন ও বাংলাদেশ ফরেষ্ট এ্যাক্ট (সংশোধিত) ২০০০ লঙ্ঘন করে বাঘাইহাট-সাজেক সড়ক তৈরি করছে।

লন্ডনে বাংলাদেশ মানবাধিকার বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

লন্ডন প্রতিনিধি

গত ১৭ জুন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব অরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ "ইউরোপীয়ান হিউম্যান রাইটস কনফারেন্স অন বাংলাদেশ: এক্সট্রিমিজম, ইনটলারেন্স এন্ড ভায়োলেন্স" (বাংলাদেশ বিষয়ক ইউরোপীয়ান মানবাধিকার সম্মেলন: উগ্রবাদ, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সহিংসতা) শীর্ষক এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেশ কয়েকটি সংগঠন ও ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত "বাংলাদেশ কনফারেন্স স্টিয়ারিং কমিটি" এই সম্মেলনের আয়োজক।

বৃটেনের হাউজ অব লর্ডসের সদস্য লর্ড এভিবুরি দিন ব্যাপী এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন পর্বে ও ওয়ার্কিং সেশনে বাংলাদেশ, ভারত ও ইউরোপের মানবাধিকার কর্মি, সমাজ কর্মি, গবেষক, লেখক, আইনজীবী বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট ও সুইডিশ পার্লামেন্টের বেশ কয়েকজন সদস্যও এতে অংশ নেন ও বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনার মোফাজ্জল করিমও আলোচনায় অংশ নেন।

বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জাতিগত সংখ্যালঘু ও আহমেদিয়া সম্প্রদায় এবং প্রগতিশীল লোকজনের ওপর অব্যাহত হামলা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র তুলে ধরতে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এছাড়া, কিভাবে একটা সমন্বিত ঐক্যমঞ্চ থেকে ধর্মীয় চরমপন্থীদের মোকাবিলা করা যায় সে ব্যাপারে নীতি কৌশল নির্ধারণ এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সহিংস জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য প্রগতিশীল গ্রুপ ও ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলাও ছিল এই সম্মেলনের লক্ষ্য।

বৃটেনে প্রবাসী জুম্মদের সংগঠন "জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক-যুক্তরাজ্য" বা সংক্ষেপে জেপিএন-ইউকে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে এবং সংগঠনটির পক্ষে শিবাশীষ রায় একটি ওয়ার্কিং সেশনে বক্তব্য রাখেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র তুলে ধরেন। জেপিএন-ইউকে এই উপলক্ষে একটি প্রচারপত্রও বিলি করে। এতে বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নেতা, ছাত্র ও মানবাধিকার কর্মিদের মিথ্যা অভিযোগে প্রতিনিয়ত হয়রানি গ্রেফতার ও নির্যাতন ও অন্তরীণ করা হচ্ছে। ২০০৩ সালে সংঘটিত মহালছড়ি হামলার আসল নায়ক লেঃ কর্ণেল আব্দুল আওয়াল এখন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত বলে উক্ত প্রচারপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্মেলনে একের পর এক বক্তা বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র তুলে ধরেন। এই অবস্থায় বৃটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাই কমিশনার মোফাজ্জল করিম তার বক্তব্যে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি যে রূপ চিত্রিত করা হয়েছে তা সেরূপ নয় বললে শ্রোতাদের মধ্য থেকে "সব মিথ্যা সব মিথ্যা" বলে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শ্রোতারা তাকে একের পর এক প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন। পরে অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি সম্মেলন স্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অপরাধী ও অপরাধীদের মদদদাতাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধেরও আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলনে আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, একটি ইউরোপীয় পার্লামেন্টের দলকে বাংলাদেশ পাঠানো হবে। এ দলটি বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে।

ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে খাগড়াছড়িতে বিশাল সমাবেশ

১ম পাতার পর

এককালে চট্টগ্রামের বিশাল এলাকা জুড়ে অবস্থান করলেও পাহাড়িরা টিকতে না পেরে পিছু হতে আসতে বাধ্য হচ্ছে। রামগড়, ফেনী ভ্যালী, বান্দরবানের লামা, আলিকদমসহ বিভিন্ন অঞ্চল এখন পুরোপুরি সেটলারদের বেদখলে চলে গেছে। কখনো বনায়নের নামে, কখনো উন্নয়নের নামে কিংবা সংরক্ষিত বনাঞ্চল সৃষ্টির নামেও পাহাড়িদের যৌথ মালিকানাধীন হাজার হাজার একর জমি কেড়ে নেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জাতিসত্তাগুলোর অস্তিত্ব এখন চরম হুমকির মুখে। এই জাতিসত্তাগুলোকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য সরকার উঠে পড়ে লেগেছে। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, বিএনপি - দেশের প্রত্যেকটি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে ধারাবাহিকভাবে একটি নীতি বাস্তবায়ন করেছে। সেটা হলো এথনিক ক্লিনজিং বা জাতিসত্তার বিনাশসাধন।

বক্তাগণ বলেন, এবার প্রতিরোধ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। পাহাড়িদের প্রথাগত যৌথ মালিকানার স্বীকৃতি ছাড়া জাতিগত অস্তিত্ব রক্ষা করা যাবে না। আর এই স্বীকৃতি আদায় করার জন্য দরকার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। একটি সুসংগঠিত ও আধুনিক পার্টির নেতৃত্বে আপামর জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন। একমাত্র ইউপিডিএফ-ই এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে।

বক্তারা বলেন, ইউপিডিএফ কখনো আপোষ করেনি। এই পার্টি কারো দয়ায় গড়ে উঠেনি এবং কারোর ইশারায় কাজ করে না। এই পার্টি জনগণেরই পার্টি, জনগণই এই পার্টিকে টিকিয়ে রেখেছেন। কোন অপশক্তি এই পার্টিকে নির্মূল করতে পারবে না। যারা ইউপিডিএফ-কে নির্মূলের দুঃসাহস দেখায় তারাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

নেতৃবৃন্দ সমাবেশে আসতে বাধা দেয়ার জন্য সেনাবাহিনী ও সরকার মদদপুষ্ট জেএসএস-এর সশস্ত্র গ্রুপগুলোর কড়া সমালোচনা করেন। তারা বলেন, সেনাবাহিনী ও এই সশস্ত্র গ্রুপগুলোই পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের শান্তি হরণের জন্য একযোগে কাজ করছে।

বক্তারা বলেন, ইউপিডিএফ এর এই মহাসমাবেশ বানচাল করে দেয়ার জন্য জোট সরকার, সেনাবাহিনী ও জেএসএস সুগভীর ষড়যন্ত্র করেছে, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের লড়াকু জনগণ তাদের এই মিলিত ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছেন। জনগণের সংগঠিত শক্তির মুখে তারা শেষ পর্যন্ত সমাবেশ পণ্ড করে দিতে পারেনি।

বক্তারা সন্তু লারমাকে জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। প্রচণ্ড গরমেও মিছিলটি ছিল সুশৃঙ্খল ও সংগ্রামী চেতনায় তেজোদ্দীপ্ত।

সমাবেশ বানচালের ষড়যন্ত্র

সেনাবাহিনী-সরকার ও তাদের লেজুর জনসংহতি সমিতি সমাবেশ বানচাল করে দেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালায়। সমাবেশের দিন সেনাবাহিনী ছিল বিশেষভাবে তৎপর। খাগড়াছড়ি-পানছড়ি সড়ক, খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়ক ও খাগড়াছড়ি-মহালছড়ি সড়ক বন্ধ করে দেয়া হয়। জিরো মাইল, চেঙ্গী ব্রিজ ও জামতলিতে সেনাবাহিনী চেকপোষ্ট বসায়। সেখানে সমাবেশের গাড়ি আটকিয়ে লোকজনকে চেক করা হয় ও সেখান থকে সমাবেশ স্থল স্বনির্ভর পর্যন্ত হেঁটে যেতে তাদেরকে বাধ্য করা হয়।

মানিকছড়িতে সেনারা ইউপিডিএফ সমর্থকদের বহন করা গাড়ি আটকায় ও রামগড়ে সমাবেশে যোগ দিতে আসা লোকজনকে হয়রানি করে।

জেএসএস-এর ন্যাক্কারজনক ভূমিকা

সমাবেশ বানচালের চেষ্টায় জনসংহতি সমিতির ভূমিকা ছিল সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক। সমিতির লোকজন পানছড়ি, দীঘিনালা ও কুদুকছড়িসহ বিভিন্ন এলাকায় সমাবেশের দিন গাড়ি না চালানোর জন্য গাড়ির মালিকদের হুমকি দেয়। এজন্য এসব এলাকা থেকে কেউ সমাবেশে যোগ দিতে পারেনি।

৪ জুন জেএসএস পানছড়িতে এলাকার মুরুব্বীদের ডেকে এই বলে হুমকি দেয় যে, যারা মহাসমাবেশে যাবে তাদেরকে ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলা হবে। প্রত্যেক গ্রামে লোকজনকে জানিয়ে দেয়া হয় যারা মহাসমাবেশের জন্য সাহায্য সহযোগিতা করবে তাদেরকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

কিন্তু জেএসএস এর এসব হুমকি সত্ত্বেও হাজার হাজার লোকজন সমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য ডুদুকছড়া, মনিপুর, পুজগাঙ, তালতলা ও লতিবানে জড়ো হয়।

জনগণ সব ধরণের বাধা উপেক্ষা করে মহাসমাবেশে যোগ দেবে এটা আঁচ করতে পেরে জেএসএস সদস্যরা মহাসমাবেশের আগের দিন অর্থাৎ ৬ জুন হরতালের ঘোষণা দেয়। ৭ জুন দুপুর ১২ টা পর্যন্ত পানছড়ি-ডুদুকছড়ায় হরতাল বলবৎ করা হয়। গাড়ির ড্রাইভারদেরকে গাড়ি না চালানোর জন্য কড়া হুমকি দেয়।

দীঘিনালায় সরকার-মদদপুষ্ট জেএসএস সদস্যরা লোকজনকে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে বলে যে, দীঘিনালা থেকে একটা পিঁপড়াও সমাবেশে যেতে পারবে না। সেখানে জনগণ খাগড়াছড়ির মহাসমাবেশে যোগ দিতে না পেরে নিজেরাই সমাবেশ করেন।

জেএসএস সদস্যরা কুদুকছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে টিকেট কাউন্টার বন্ধ করে দেয়। গাড়ি চলাচলে বাধা দেয়। মহাসমাবেশে যোগ দিতে না পেরে কুদুকছড়িতে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাবেশ করেন।

২২মে সমাবেশের পোষ্টার লাগানোর দিন থেকে জেএসএস মহাসমাবেশটির বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা চালাতে থাকে। ঐদিন তারা চেঙ্গী স্কোয়ারে লাগানো পোষ্টার ছিঁড়ে দেয়। এতে ইউপিডিএফ সমর্থকরা প্রতিবাদ করলে জেএসএস-এর সদস্যরা মারমুখী হয়। পরে ইউপিডিএফ-এর সমর্থক ও সাধারণ লোকজন মিলে তাদেরকে ঐ এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়।

সেনাবাহিনী এই ঘটনাকে ব্যবহার করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। তারা উক্ত ঘটনার জের ধরে ইউপিডিএফ নেতা কর্মিদের গ্রেফতার করার জন্য পুলিশের ওপর চাপ দেয়। সমাবেশ বানচাল করাই ছিল লক্ষ্য। পরে সেনাবাহিনীর চাপাচাপিতে পুলিশ পরদিন অর্থাৎ ২৩ মে ১৪ জন ইউপিডিএফ নেতা কর্মিকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের সময় ইউপিডিএফ এর নেতৃবৃন্দ মহাসমাবেশ সফল করা বিষয়ে পার্টির সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত সদস্যদের সাথে সভা করছিলেন। গ্রেফতারের পরই কেবল তাদের বিরুদ্ধে মামলা রজু করা হয়।

এরপর জনসংহতি সমিতি লোকজনকে সমাবেশে যোগদান থেকে বিরত রাখতে বিভিন্ন গুজব ছড়ায় ও হুমকি দিতে থাকে। ২৪ মে পূণ্যমনি চাকমা নামে একজন পিক-আপ ভ্যান চালককে অপহরণ করা হয়। অপহরণের কারণ ইউপিডিএফ-এর প্রচারণার কাজে তার গাড়িটি ভাড়া দেয়া। ২৭ মে পিসিপি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে যোগ দেয়ার কারণে মহালছড়িতে ১৫ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে জেএসএস-এর আস্তানা-খ্যাত মুভাছড়িতে ডেকে নিয়ে প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয়। তাদেরকে ইউপিডিএফ আহুত মহাসমাবেশে যোগ না দেয়ার জন্যও হুমকি দেয়া হয়।

২৮ মে জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা বাবুছড়ায় হামলা চালায়। সেনাবাহিনীর পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় তাদের সশস্ত্র গ্রুপগুলো বিশেষভাবে তৎপর হয়। কমলছড়ি, মহালছড়ি, গুরগুজ্যাছড়িসহ ইউপিডিএফ সমর্থিত এলাকায় ব্যাপক সেনা মোতায়েন করা হয়। জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যরা সমাবেশে অংশগ্রহণ না করার আহ্বান জানিয়ে কম্পিউটার কম্পোজ করা একটি প্রচারপত্র বিলি করে। এই প্রচারপত্রে বলা হয়, যে তাদের আদেশ অমান্য করে সমাবেশে অংশগ্রহণ করবে তাকে নগদ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হবে ও উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে। গ্রামে গ্রামে এই প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

সেনাবাহিনী ও জেএসএস-এর সশস্ত্র গ্রুপগুলোর তৎপরতার উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মনে ভীতির সঞ্চার করা, যাতে তারা সমাবেশে অংশ নিতে উৎসাহী না হয়। কিন্তু সরকার-সেনাবাহিনী ও জনসংহতি সমিতির সকল ষড়যন্ত্র, হুমকি ও বাধা উপেক্ষা করে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইউপিডিএফ আহুত মহাসমাবেশে যোগ দেন। জ্যোষ্ঠের কাঠফাটা রৌদ্রে দশ সহস্রাধিক নারী পুরুষ ভূমি বেদখল বিরোধী মহাসমাবেশে যোগ দিয়ে সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে এই বার্তাই পাঠিয়েছেন যে, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের দিন শেষ। চোরের দশ দিন গৃহস্থের একদিন। এতদিন সুবিধাবাদীরা ধান্ধাবাজরা ও হরেক রকমের প্রতিক্রিয়াশীলরা লাফালাফি করেছে। এবার জনগণ জেগে উঠেছেন, এবার তারা প্রতিটি দাবি কড়ায় গণ্ডায় হিসাব নেবেন। সুতরাং ষড়যন্ত্রকারী দন্ডমুন্ডের কর্তারা সাবধান!

খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ অফিসে পুলিশী হামলা, ১৪ জন গ্রেফতার

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি

২৩ মে পুলিশ খাগড়াছড়ির স্বনির্ভরস্থ ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের অফিসে হামলা চালিয়ে জেলা ইউনিটের নেতা প্রদীপন খীসাসহ ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে পুলিশ অফিসে হানা দেয়। এ সময় পার্টির খাগড়াছড়ি ইউনিট নেতৃবৃন্দ ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে আহুত ৭ জুনের মহাসমাবেশ সফল করতে পার্টির অঙ্গ সংগঠন ও আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের সাথে সভা করছিলেন।

গণ গ্রেফতার থেকে সাধারণ লোকজনও বাদ যাননি। দীঘিনালা থেকে আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে আসা ইন্দু বিকাশ চাকমাকেও পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। পুলিশী হামলার সময় তিনি ইউপিডিএফ অফিসের পাশে ছিলেন।

গ্রেফতারের পরই ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দকে থানায় নেয়া হয়। আটককৃতরা হলেন ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি ইউনিটের নেতা প্রদীপন খীসা, নতুন কুমার চাকমা, রনি ত্রিপুরা, পাহাড়ি যুব ফোরামের সাবেক সভাপতি অপু চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি পুলক চাকমা, সাধারণ সম্পাদক অনি বিকাশ চাকমা, সদস্য ক্যারিংটন চাকমা ও আরো তিন জন।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক অন্তরিকা চাকমাকেও পুলিশ গাড়িতে ওঠায়, কিন্তু পরে ছেড়ে দেয়।

আটককৃত ইউপিডিএফ সদস্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দেয়া হয়েছে। বর্তমানে তাদেরকে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে রাখা হয়েছে।

ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে আহুত ৭ জুনের মহাসমাবেশ বানচালের উদ্দেশ্যে ইউপিডিএফ সদস্যদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এই সমাবেশ বানচালের জন্য সরকার ও সন্তু চক্র এক জোট হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। গ্রেফতারের আগের দিন অর্থাৎ ২২ মে সরকার মদদপুষ্ট সন্তু বাহিনী চেঙ্গী স্কোয়ারে ৭ জুনের পোষ্টার ছিঁড়ে দেয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউপিডিএফ-এর সমাবেশ পণ্ড করে দেয়ার ষড়যন্ত্র নতুন কিছু নয়। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন পাহাড়ি গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ সম্মেলন পুলিশ ও জেএসএস বানচাল করে দেয়। যৌথ সম্মেলনের স্থান যেখানে ঘোষণা করা হয়, সেখানেই একই দিন একই সময়ে সমাবেশ করার কথা ঘোষাণা করে জেএসএস-এর লোকজন। এরপর পুলিশ উক্ত স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করে। দুই সংগঠন সম্মেলনের স্থান পরিবর্তন করার পরও পুলিশ বিনা উস্কানিতে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে দুই জনকে হত্যা করে। একই বছর ২২ অক্টোবর বাবুছড়ায় সেনা হামলার প্রতিবাদে আহুত সমাবেশও জেএসএস পুলিশ বানচাল করে দেয়। এর পর চট্টগ্রামে ইউপিডিএফ-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান অত্যন্ত বর্বরভাবে পণ্ড করে দেয়া হয়। মধ্যরাতে পুলিশ লাল দীঘি ময়দানে অনুষ্ঠানের জন্য নির্মিত প্যান্ডেল ভেঙে দেয়। অনুষ্ঠানে তিন পার্বত্য জেলা ও চট্টগ্রামের বন্দর থেকে যোগ দিতে আসা ইউপিডিএফ কর্মি ও সমর্থকদের গণ হারে গ্রেফতার করে। অংশগ্রহণকারীদের জন্য রান্না দুপুরের খাবার পর্যন্ত মাটিতে ছিটিয়ে নষ্ট করে দেয়। পার্টি যাতে গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন চালাতে না পারে, জেএসএস-এর আত্মসমর্পনের পর নতুনভাবে যাতে গণআন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে সে জন্য ইউপিডিএফ এর ওপর দমন পীড়ন অব্যাহত থাকে।

পিসিপির ১৪ কর্মি সমর্থকের মুক্তির দাবিতে খাগড়াছড়িতে মিছিল ও সমাবেশ

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি ২১মে খাগড়াছড়িতে তাদের ১৪ জন কর্মি ও সমর্থকদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। এদেরকে তার আগের দিন অর্থাৎ ২০ মে পিসিপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে ফেরার পথে দীঘিনালা থেকে জেএসএস-এর সদস্যরা অপহরণ করেছিল।

মিছিলটি স্বনির্ভর এলাকা থেকে শুরু হয়ে শাপলা চত্বর যাওয়ার পথে চেঙ্গী স্কোয়ারে পুলিশী বাধার সম্মুখীন হলে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর মিছিলটি কলেজ পাড়ার ভিতর দিয়ে স্টেশন ও খবংপুজ্যা হয়ে আবার স্বনির্ভরে ফিরে আসে। সেখানেও একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পিসিপির কেন্দ্রীয় সভাপতি রূপন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা এবং সাংগঠনিক সম্পাদক রিকো চাকমা।

নেতৃবৃন্দ পিসিপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে যোগ দিতে আসা অপহৃত কর্মি ও সমর্থকদের মুক্তির দাবি জানান এবং অপহরণকারী জেএসএস সদস্যদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, প্রশাসনের নাকের ডগায় দীঘিনালার রিবেং ক্লাবে জেএসএস সদস্যরা নির্বিঘ্নে অপহরণ, চাঁদাবাজি, খুনসহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজ করে যাচ্ছে। অথচ পুলিশ এ ব্যাপারে কিছুই করছে না।

নেতৃবৃন্দ এর পরিণাম শুভ হবে না উল্লেখ করে বলেন, সেনাবাহিনী ও প্রশাসন যদি জেএসএস-কে মদদদান বন্ধ না করে ও তাদের অপকর্মে সম্মতিবাচক মনোভাব ত্যাগ না করে, তাহলে সেক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের উদ্যোগে জেএসএস-এর এ সব অপকর্ম রোধে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হবে।

রামগড়ে গরীব পাহাড়িদের জমি বেদখলের ষড়যন্ত্র

চাষী মং,

খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় থানাধীন খাগড়াবিল এলাকার রূপাইছড়ি ও স্কুল পাড়াতে অনুপ্রবেশকারীরা পাহাড়িদের বাগান ও জমি বেদখলের ষড়যন্ত্র করছে। উক্ত গ্রামের খেজাঅং মারমা, রূপেন্দ্র ত্রিপুরা, রহিম ত্রিপুরা, খরগজ চন্দ্র ত্রিপুরা ও আঞ্জু মারমার আম কাঠালের বাগান বাগিচাগুলো সেটলাররা নিজেদের জায়াগা দাবি করে কেটে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এতে সহযোগিতা করছে মহসিন লিডার, মোঃ হাসেম মেম্বার ও জামশেদ। এরা জুম্মদের জায়গাগুলো বেদখলের চেষ্টা চালাচ্ছে।

এ ষড়যন্ত্রে ওয়াদুদ ভুঁইয়ার (এমপি) বড় ভাই বেলায়েত হোসেনেরও হাত রয়েছে। সে পাহাড়িদের জায়গা জমি বেদখলের জন্য সেটলারদের নিয়মিত উস্কানি দিয়ে থাকে।

সেনা নির্যাতন

গত ২০ মে শুক্রবার ভোর ৫টা নাগাদ সিন্দুকছড়ি জোনের অধীন পাতা ছড়া ক্যাম্প অধিনায়ক ৪০ জন সৈন্য নিয়ে রামগড় থানার মরাকাইল্যা নামক স্থানে রাঙাচুলা কার্বারীর বাড়িতে হামলা চালায়। সেদিন কার্বারী বাড়িতে ছিলেন না। সেনারা তাকে না পেয়ে তার ছেলে যুদ্ধ কুমার চাকমার (৩৫) ওপর ভীষণভাবে শারীরিক নির্যাতন চালায়। ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় এবং যাওয়ার সময় নগদ ১,৭০০ টাকা, ছাতা ২টি ও দা, কুড়ালগুলো লুট করে নিয়ে যায়। হামলার সময় সেনাদের সাথে কয়েকজন সেটলার বাঙালীও ছিল।

নির্যাতনের পর যুদ্ধ কুমার এখনো সুস্থ হয়ে ওঠেনি। চিকিৎসা করার মতো সামর্থ্যও নেই।

২০ মে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে খাগড়াছড়িতে সমাবেশের কর্মসূচী ছিল। ঐ কর্মসূচীতে যাতে সেখান থেকে লোকজন অংশগ্রহণ করতে না পারে সেজন্য ভীতি সঞ্চার করতে এভাবে হামলা চালানো হয়েছে বলে লোকজন এমন ধারণা পোষণ করছে।

সেনারা স্বাধিকারের কপি কেড়ে নিয়েছে

গত ২০ মে ২০০৫ মাজলং বাজার থেকে ২০ বেঙ্গলের সেনা জোয়ানরা বিক্রেতার কাছ থেকে স্বাধিকার পত্রিকার কপি ছিনিয়ে নেয় এবং মারধর করে।

ঐদিন বাঘাইছড়ি থানার সাজেক ইউনিয়নের মাজলং বাজারের সাপ্তাহিক হাট দিবস। মিলন প্রিয় চাকমা (২০) নামে ইউপিডিএফ-এর এক শুভার্থী স্বাধিকার ৩২তম সংখ্যার কপি বিক্রি করছিল। নন্দরাম আর্মি ক্যাম্প (প্রকাশ টাইগার টিলা ক্যাম্প) থেকে মাজলং বাজারে আসা এক দল সেনা জোয়ান মিলন প্রিয়কে স্বাধিকার বিক্রি করতে দেখে তার উপর চড়াও হয়। সেনা সদস্যরা তার হাত থেকে ৬ কপি স্বাধিকার কেড়ে নেয় এবং স্বাধিকার বিক্রির জন্য মারধর করে। দৈহিক নির্যাতন করার পরও সেনারা তাকে অপ্রাসঙ্গিক বিভিন্ন আবোল তাবোল প্রশ্ন করে হয়রানি করে।

উল্লেখ্য, নন্দরাম আর্মি ক্যাম্পটি দুই আড়াই মাস আগে স্থাপন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে সেখানে কোন আর্মি ক্যাম্প ছিল না।

কাউখালিতে সেটলার কর্তৃক জমি বেদখল চলছে

রাঙ্গামাটির কাউখালির গুমুত্যাতলি ও গাছ ভাঙা নামক এলাকায় প্রশাসনের ইন্ধনে ২০০ সেটলার পরিবার পাহাড়িদের জমিতে জোর করে বসতি স্থাপন করছে। ইতিমধ্যে তারা ঘরবাড়ি নির্মাণ শুরু করে দিয়েছে। পাহাড়ি জমির মালিকরা প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছে না, কারণ সেটলাররা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর হুমকি দিচ্ছে।

গুমুত্যাতলি ও গাছ ভাঙা এলাকায় নতুন করে বসতিস্থাপনের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে অভিযোগ করা হলেও আজ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। সেটলাররা প্রত্যেক দিন দল বেঁধে এসে ঐ এলাকায় ঘরবাড়ি নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তারা পাহাড়িদের বাগিচার মূল্যবান গাছ বাঁশ কেটে নিয়ে যাচ্ছে ও বাগান ধ্বংস করে দিচ্ছে।

জনগণ এর প্রতিকার চায়।

দাঁড়িয়ে সালাম না দেয়ায়

পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন কোন ক্যাম্প কমান্ডার জোর করে লোকজনের কাছ থেকে সম্মান আদায় করতে চান। সমতলে যাদের কানাকড়িও আমল নেই, পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা এক একজন সম্রাট! এরা পাহাড়িদেরকে মানুষ বলে মনে করে না। পাহাড়িদের তারা পা মাড়িয়ে চলে। যুক্তি তর্ক করা বা অধিকারের কথা বলা মানে তো রীতিমত অপরাধ। এমন কি সালাম না দেয়াও বড় ধরনের অপরাধ।

২০মে ছিল মাজলং বাজারের হাট দিবস। বাজারের পার্শ্ববর্তী এগোজ্যা ছড়ির বাসিন্দা এরেবো চাকমা, ২২, (পিতা আদেন্দ্র চাকমা) তার নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে (মাজলং বাজারের কাছে রাস্তার ধারে) তামাক খাচ্ছিলেন। এমন সময় রুইলুই থেকে ২০ -২৫ জনের মতো এক দল বিডিআর (৩২ ব্যাটালিয়ন) বাজারে যাচ্ছিল। তারা প্রায়ই এই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করে থাকে এবং তাদের অনেকের সাথে স্থানীয় গ্রামবাসীদের পরিচয়ও রয়েছে। সুতরাং বিডিআর সদস্যরা আসা যাওয়া করবে, আর গ্রামবাসীরা যে যার কাজে ব্যস্ত থাকবে সেটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সেদিন বাজারে যাওয়ার পথে একজন বিডিআর কোন কারণ না দেখিয়ে বাড়িতে ঢুকে এরেবো চাকমাকে ইচ্ছে মতো বুট জুতো দিয়ে লাথি মেরে আধমরা অবস্থায় রেখে যায়।

পরে গ্রামবাসীরা কেন তাকে এভাবে মারধর করা হয়েছে তা জানতে চাইলে, স্থানীয় রুইলুই বিডিআর ক্যাম্পের সুবেদার জুলফিকার বললেন, "আপনারা চিনেন না, উনি আমাদের ব্যাটালিয়নের টু-আই.সি. (সেকেন্ড ইন কমান্ড)। সাহেবকে দেখা মাত্র দাঁড়িয়ে সালাম না দেয়ায় তিনি রেগে গিয়েছেন। বুঝেন না, আমাদের স্যারেরা তো নিরীহ লোকের সুখ দুঃখ ভাবেন না। তারা চান সালাম আর সালাম। সালাম খাওয়াই হলো উনাদের জীবন। আর সালাম দেয়াই হলো আপানাদের নিয়তি।"

উক্ত সাহেবের (টু-আইসি) নাম আব্দুল আজিজ বলে জানা গেছে।

কাউখালীতে আঞ্চলিক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সামাজিক কু-সংস্কার ও অবক্ষয়ের কবল থেকে বেরিয়ে আসুন, দিন বদলের নয়া আন্দোলন সংগ্রামে যোগ দিন - এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গেল ২৬ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটির কাউখালির তালুকদার পাড়ায় দিন ব্যাপী এক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইউপিডিএফ কাউখালি ইউনিট এই সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি ইউনিটের প্রধান সমন্বয়কারী রুইখই মারমা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলার প্রধান সমন্বয়ক সচিব চাকমা, পাহাড়ি যুব ফোরামের দপ্তর সম্পাদক মিঠুশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অন্তরিকা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সহ-সাধারণ সম্পাদক সুনির্মল চাকমা (জিম্পু) প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি জেলা ইউনিটের সদস্য সচিব শান্তি দেব চাকমা।

প্রথমবারের মতো যুব সম্মেলন এলাকায় ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে। সহস্রাধিক যুবক ও যুব-মহিলা এই সম্মেলনে অংশ নেন।

কল্পনা চাকমা অপহরণের ৯ বছর পূর্তিতে ঢাকায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের মিছিল, সমাবেশ ও আলোচনা সভা

মলিনা চাকমা

কল্পনা চাকমা ১৯৯৫ সালে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ১ম কেন্দ্রীয় সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন

কল্পনা চাকমা অধিকার সচেতন এক সংগ্রামী নারীর প্রতীক। তার নাম উচ্চারিত হলেই পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত অত্যাচারী সেনা শাসকদের লোম খাড়া হয়ে যায়। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষা ইত্যাদি শব্দজালের আড়ালে লুকিয়ে রাখা তাদের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়ে পড়ে। কল্পনা চাকমার ক্ষুরধার যুক্তির কাছে পরাজিত হলে ও তার তীক্ষ্ণধী প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস রাতের অন্ধকারে তাকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়। সেনা শাসকদের পরাজয় ঠিক এখানেই। যুক্তি ও সত্যকে তারা মোকাবিলা করতে চায় গায়ের জোরে। অস্ত্রের জোরে তারা দাবিয়ে রাখতে চায় ন্যায়কে। বন্দুকের নলের মুখে তারা সমগ্র জাতি ও জনগণকে দমন করতে চায়। কিন্তু তারা জানে না, কল্পনা চাকমারা কখনোই হারিয়ে যায় না। কল্পনা চাকমা আমাদের মাঝেই আছেন; জীবন্ত প্রাণবন্ত ও চির প্রেরণাদাত্রী হিসেবেই আছেন।

সেজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের সংগ্রামী নারী সমাজ প্রতি বছর ১২ জুন পালন করে থাকে। এদিন তারা কল্পনা চাকমার নাম স্মরণ করে সেনা নায়কদের গালে চপেটাঘাত দেয় আর সংগ্রামের প্রতি অবিচল থাকার অঙ্গীকার নবায়ন করে।

এ বছর ১২ জুন কল্পনা চাকমা অপহরণের ৯ বছর পূর্তিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। সকালে জাতীয় জাদুঘর গেট সংলগ্ন শাহবাগ এলাকায় এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি সোনালী চাকমা। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সামিউল আলম রিচি, জাতীয় ছাত্র দলের সভাপতি প্রকাশ দত্ত, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক রিকো চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি দীপংকর চাকমা, কণিকা চাকমা ও নারী প্রগতির শাপলা। সভা পরিচালনা করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অন্তরিকা চাকমা।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে কল্পনা অপহরণের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ এবং চিহ্নিত অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস ও তার দোসরদের বিচারের দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ কল্পনা অপহরণের ৯ বছর অতিবাহিত হলেও তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তদন্ত রিপোর্টের ব্যাপারে মুখ না খোলা ও নীরবতা পালন অপহরণকারীদের রক্ষার নামান্তর।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে কল্পনাদের অপহরণ আজও বন্ধ হয়নি। নিরাপত্তার নামে নিয়োজিত সেনাদের হিংস্র দৃষ্টি এখনো কল্পনাদের দিকে নিবদ্ধ। সেনা ক্যাম্প সম্প্রসারণ নিপীড়ন নির্যাতন চালানোর ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে। সেনা টহল জনগণকে সন্ত্রস্থ রাখা আর নারীদের উত্যক্ত করার মহড়া ছাড়া আর কিছু নয়।

তারা অভিযোগ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অপারেশন উত্তরণ চলছে। এলাকায় এলাকায় সেনাদের খবরদারি, হুমকি, নির্যাতন ও ধরপাকড় অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯৭ সালের বিতর্কীত "পার্বত্য চুক্তিকে" নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জীবনে অভিশাপ ও শাসকগোষ্ঠির শোষণের হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করেন।

এছাড়া নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো ২৮ হাজার সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র করছে। তারা সরকারের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন এবং অবিলম্বে ভূমি বেদখল ও সেনা ক্যাম্প সম্প্রসারণ বন্ধ করার দাবি জানান।

শাসক গোষ্ঠির চোখ রাঙানি, নিপীড়ন নির্যাতন ও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য নারীকে অবদমিত করে রাখতে পারবে না বলে নেতৃবৃন্দ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল শাহবাগ হতে শুরু হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে শেষ হয়।

বিকেলে পাবলিক লাইব্রেরী সেমিনার কক্ষে "সামরিকায়িত অঞ্চলে নারীর নিরাপত্তা প্রশ্ন: পরিপ্রেক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনায় অংশ নেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর কেন্দ্রীয় সদস্য রবি শঙ্কর চাকমা, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. আমেনা মহসিন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। সভায় সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা।

কল্পনা চাকমা অপহরণের ৯ বছর পূর্তিতে ঢাকায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিক্ষোভ মিছিল। তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এখনো আলোর মুখ দেখেনি। ফটো: এইচডব্লিউএফ

জমি বেদখলের প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে কাউখালিবাসীর স্মারকলিপি

কাউখালি প্রতিনিধি

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাউখালি উপজেলার গুমুত্যাতলী (শামুকছড়ি) এলাকার সর্বস্তরের পাহাড়ি জনগণ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছেন। উপজেলার ৯৮ নং কচুখালী মৌজার গুমুত্যাতলিতে পাহাড়িদের দখলীয় আনুমানিক ১৫০ একর জমিতে সেটলারদের কর্তৃক বেআইনীভাবে বাড়িঘর নির্মাণের যে প্রক্রিয়া চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে এই স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, উক্ত পাহাড়ের উপর জোরপূর্বকভাবে বহিরাগত বাঙালীরা ঘরবাড়ি নির্মাণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখলে পাহাড়ি জনগণের মনে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়ে এ এলাকার পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিতে পারে। বর্তমানে ঐ পাহাড়ি মালিকানাধীন পাহাড়ি জমিতে রোপনকৃত বিভিন্ন মূল্যবান গাছ যেমন গামার, সেগুন ও অন্যান্য ঔষধি গাছগুলো কাউখালি উপজেলা প্রশাসনের পরোক্ষ ইন্ধন ও সহযোগিতায় নির্বিচারে কেটে নেয়া হচ্ছে।

পাহাড়ি যুব ফোরামের কাউন্সিল সমাপ্ত:

সংগঠনের নাম পরিবর্তন: এখন থেকে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি

গত ১৩ মে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে পাহাড়ি যুব ফোরামের দ্বিতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। স্টুডিও থিয়েটারে দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম বা ইংরেজীতে ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ফোরাম রাখা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলাসহ ঢাকা ও চট্টগ্রামের শতাধিক প্রতিনিধি কাউন্সিলে অংশ নেন। সকাল ১০টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। পাহাড়ি যুব ফোরামের সভাপতি অপু চাকমা এতে সভাপতিত্ব করেন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউপিডিএফ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ধ্রুব জ্যোতি চাকমা, চট্টগ্রাম ইউনিটের সদস্য অনিমেষ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ভবতোষ চাকমা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দীপংকর চাকমা। তিনি সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি রিপোর্ট পেশ করেন।

অতিথি বক্তরা ছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন পাহাড়ি যুব ফোরামের প্রতিনিধিবৃন্দ। এরা হলেন সহ-সাধারণ সম্পাদক রিন্টু চাকমা, মহানগর শাখার সভাপতি রিংকু চাকমা, কাউখালি শাখার সহ-সভাপতি লক্ষী মনি চাকমা ও দীঘিনালার প্রতিনিধি বাইরন চাকমা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিসত্তাগুলোর ওপর এখনো দমন পীড়ন অব্যাহত রয়েছে। সেটলার কর্তৃক ব্যাপক হারে ভূমি বেদখল করা হচ্ছে এবং সেনা বাহিনীর নির্যাতন জারী রয়েছে। বক্তারা সরকারের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাদের ওপর নিপীড়ন নির্যাতন বন্ধ করে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

অধিবেশনের শেষের দিকে সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। দীপংকর চাকমা হলেন এই নতুন কমিটির সভাপতি ও মিঠুন চাকমা সাধারণ সম্পাদক। এছাড়া সুপার জ্যোতি চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক, রিংকু চাকমাকে দপ্তর সম্পাদক, মাইকেল চাকমাকে অর্থ সম্পাদক, রূপন চাকমাকে তথ্য ও প্রচার সম্পাদক ও অলকেশ চাকমাকে সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে।

নতুন কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি যুব সম্প্রদায়ের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অবিচল থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে এবং জাতীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত সকল তরুণ সমাজকে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।
সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ২০১, ড. কুদরত-ই-খুদা হল (পুরাতন), বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, হাজারিবাগ, ঢাকা - ১২০৯

বন্দী মুক্তির দাবিতে খাগড়াছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

স্বর্ণা চাকমা

২৩ মে ইউপিডিএফ জেলা কার্যালয়ে পুলিশী হামলা এবং প্রদীপন, নতুন কুমার, পুলক সহ আটককৃত ইউপিডিএফ ও পিসিপির ১৪ জন নেতাকর্মিকে আটক ও মিথ্যা মামলায় জড়িত করার প্রতিবাদে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ২৫ মে বিকেলে খাগড়াছড়ি সদরে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। মিছিলটি খাগড়াছড়ি সদরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করার পর হবংপুজ্যা স্বনির্ভর বাজারে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সোনালী চাকমা, সাধারণ সম্পাদক অন্তরিকা চাকমা, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক স্বর্ণা চাকমা এবং খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি সুমনা চাকমা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ইউপিডিএফ কর্তৃক আহুত ৭ জুনের সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী তিন সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম সমন্বয়ে বৈঠক চলাকালে পুলিশ বাহিনী বিনা উস্কানিতে হামলা চালিয়ে ইউপিডিএফ নেতা প্রদীপন খীসা, নতুন কুমার চাকমা, পিসিপি নেতা পুলক চাকমা, অনি বিকাশ চাকমাসহ ১৪ জন নেতা কর্মিকে হেনস্তা ও মারধর করে থানায় নিয়ে গিয়ে আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলাও দায়ের করা হয়েছে। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের উপরও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এভাবে ইউপিডিএফ এর মতো একটি গণতান্ত্রিক দলের ওপর হামলা চালিয়ে ও নেতা কর্মিদের মিটিং থেকে গ্রেফতার করে প্রশাসন ন্যাক্কারজনকভাবে ফ্যাসিবাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

তারা প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, প্রশাসন শুধু পার্টি কার্যালয়ে হামলা ও নেতা কর্মিদের গ্রেফতার করে ক্ষান্ত হয়নি, উপরন্তু পুলিশ বাহিনী দ্বারা এখনো পর্যন্ত ইউপিডিএফ কার্যালয় অবরোধ করে রেখেছে। নেতৃবৃন্দ প্রশাসনের এ ধরনের অগণতান্ত্রিক আচরণ ও দমন-পীড়নের তীব্র নিন্দা জানান। সরকারের এহেন ভূমিকা পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলবে বলে নেতৃবৃন্দ মত ব্যক্ত করেন এবং প্রশাসনের প্রতি অবিলম্বে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণের দাবি জানান। অন্যথায় পরিস্থিতি ভিন্নখাতে প্রবাহিত হলে তার জন্য সরকারকেই দায়ি থাকতে হবে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ আটককৃত সকল নেতাকর্মির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও তাদের সকলকে অবিলম্বে নিঃশর্তভাবে মুক্তি দেয়ার দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি চেঙ্গী স্কোয়ার পর্যন্ত যেতে চাইলে পুলিশ আবারো উপজেলা কার্যালয়ের সামনে বাধা প্রদান করে। সেখানে আর একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী খাগড়াছড়িতে পালিত

শাসক গোষ্ঠির ভাগ করে শাসন করার কূটকৌশল মোকাবিলা করে পিসিপির নেতৃত্বে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ২০ মে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

খাগড়াছড়িতে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের পর কবুতর উড়িয়ে উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিসিপির সভাপতি রূপন চাকমা। এতে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মৃদুল কান্তি দাস, বাংলাদেশ ছাত্র কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া জনি, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা ও ইউপিডিএফ নেতা অনিমেষ চাকমা। সভা পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা।

নতুন আঙ্গিকে ও তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে ইউপিডিএফ-এর ওয়েবসাইট পুনরায় চালু হয়েছে। www.updfcht.org ক্লিক করুন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও জনগণকে জানুন।